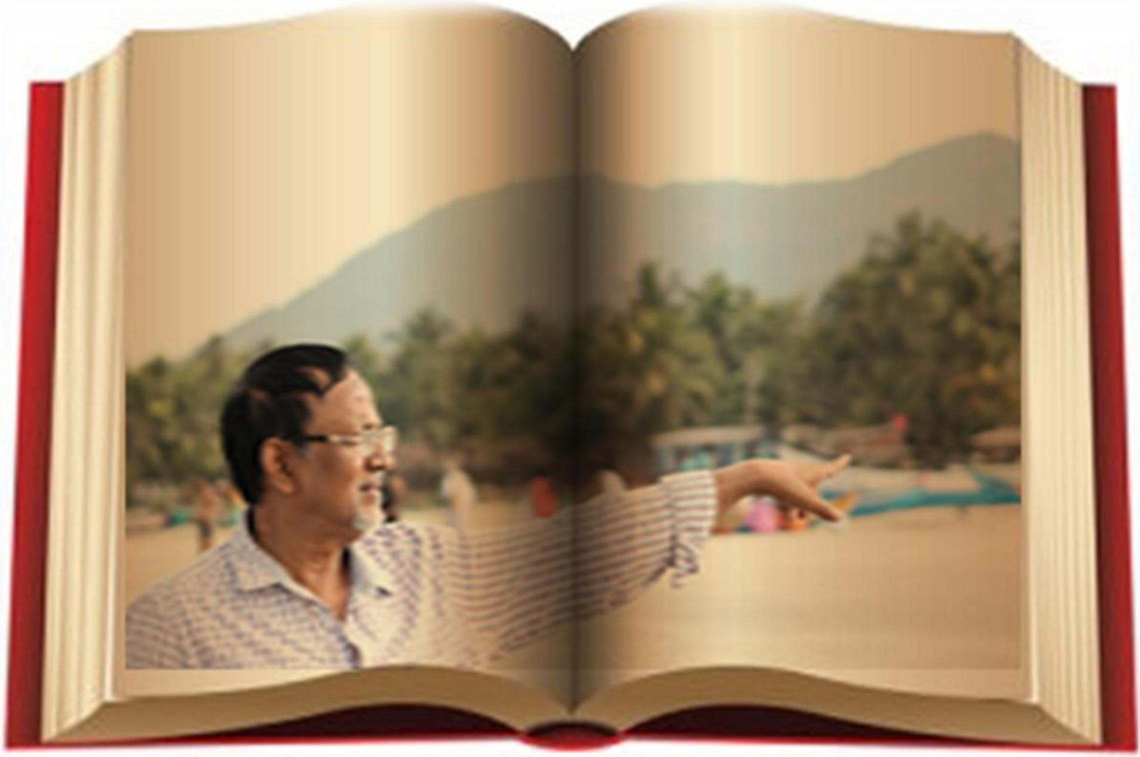

নির্বাচিত গল্প সংকলন
ফ্রি ই বুক ২
রণবীর পুরকায়স্থ

নির্বাচিত ছোটোগল্প সংকলন ২০১৮

Free e-Book 2



সূচিপত্র

নিভৃত ছায়া

রাই আর সোহাগকে সামনাসামনি দেখলে কেউ ভাববে না ওরা দুইবোন নয়। দুজনেই দীর্ঘাঙ্গী পাঁচ-চারের কাছাকাছি। মফসসল শহর শিলচরের কলেজে লাক্স হিমানি কান্তা সেন্ট এর ভুরভুরে গন্ধে যতটুকু আকর্ষণীয় থাকা যায়,থেকেছে। এখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কত কী, চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত সুন্দরের তেলমশলা। তাই এখনও দুরন্ত সুন্দরী। রাইএর বর দয়াশঙ্কর তো মস্তবড় ডাক্তার। কলকাতা এলে থেকেছে এবার পিয়ারলেসএ, গ্র্যান্ড তাজ বেঙ্গল গেটওয়েতে থাকতে পারে, কিন্তু নিউ মার্কেটের কাছাকাছি থাকা আর আহেলির খানা এই লোভেই থাকে। সোহাগের ফ্ল্যাট বাইপাসের হাইল্যাণ্ড পার্কে, নিজের গাড়ি ডাটসুন গো আর বর অভিজিতের সাদা গাড়িতে লেখা ভারত সরকার। সাদা গাড়ি নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, রাই বলল আরো বড় গাড়ি চাই। আসলে এ সব স্নায়ুর যুদ্ধ, অর্থবল যার বেশি সেই জেতে। সোহাগ সবসময় হেরেই যায় দয়াদার কাছে, আবার দয়াশঙ্করই মধ্যস্থতা করে সমাধান দেয়। বলে,

--গাড়িটা প্রধান নয়, মেন হল চালক। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে সুলতান, তোমরাও তো দেখেছ, ভাল লাগবে। দেখে নিও।

কথামতো, সোমবার সকাল সাতটায় সোহাগ আর অভিজিৎ রেডি হয়ে বসে থাকে। অভি বলেছে বেল বাজলেই কফি বসিয়ে দিতে, সে দরজা খুলে দেবে। বেল বাজে দুটো, একটা ডোরবেল আর একটা মোবাইলের রিংটোন, দরজাঘণ্টির মতোই বাজে। ধরার আগে অভিজিৎ সোহাগের দিকে অনুনয়ের তর্জনী দেখিয়ে বলে, প্লিজ। মানে কথা মতো কাজ হয় না, তাই সোহাগ কফি বসিয়ে দরজা খুলে দেয়, অভি মোবাইল হাতে ব্যালকনিতে। লোকটাকে নিয়ে এই এক ঝামেলা, মোবাইল বাজলে আর কিছুর ঠিক থাকে না। সর্বক্ষণ মোবাইল আর ল্যাপটপ। দুক্ষেত্রেই অনুরোধের আঙুল তুলে বলবে, এক্সকিউজ মি। সোহাগ রাগ করলে বলে, কী করব বল চাকরি বাঁচাতে হবে।

বন্ধুর বাড়িতে কফি খেয়ে কাপ ধুয়ে মুছে দুর্গা স্মরণ করে যাত্রারম্ভ করে রাই। সোহাগের ওসব বালাই নেই, ড্রাইভার সুলতানের জিম্মায় স্যুটকেস দিয়ে বলে, সুলতানভাই নিউ কেলিনওয়ার্থে যাবে, ব্রেকফাস্ট তুলব। খাবারের কথায় ডাক্তার দয়াশঙ্কর মিশ্র যেন গোলকিপার রাইর ভুলে দার্বি হেরে যায়। রাইকে কানে কানে বলে,

--- তোমার না কিছু খেয়াল থাকে না।

সোহাগ বন্ধুর পাশেই ছিল, বলে,

--- সবে শুরু দয়াদা, খর্চা শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

দয়াশঙ্কর উজ্জীবিত হয়ে বলে,

--তাহলে ড্রিংক্স আমার, হার্ড কোল্ড সব। টিচার্স আনি, কী বল অভিজিৎ?

--- লাগবে না মাইফ্রণ্ড। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে...। সব আছে ওতে, শ্যাম্পেন আছে ওয়াইন আছে সোডা আছে। শটগ্লাস আছে ডিকান্টার আছে টম্যাটো জুস আছে, নুনের প্যাকেট আছে, শুধু গুছিয়ে বসতে দাও।

--- টম্যাটো জুস আর নুন দিয়ে কী হবে? স্কচ নেই? আমি আনব?

--- মাংকি শোল্ডার আছে সেভেন ফিফটি, ম্যাক্সিকান সিলভার টাকিলাও আছে। ব্রেকফাস্ট প্যাকেট নিতে সুলতান একা গেলেই হয়, তবু সকালের কলকাতা দেখতে অভিজিতের সঙ্গে দয়াশঙ্করও নামে, রাই নামতে সোহাগও নামে। অভিজিৎ রিসেপশনের শাড়িপরা যুবতির বুকের দিকে ঝুঁকে চোখ উঠিয়ে নেয়, পকেট থেকে পাওয়ার গ্লাসটা বের করে চোখে লাগিয়ে আবার ঝুঁকে, আবার খুলে চশমা, বলে,

--- সো শ্বেতা, আপনি নন, সামবডি। মে বি অলিভিয়া, বলেছিল ফুড রেডি।

--- ইয়েস স্যার। টেক অ্যাওয়ে।

বিল প্যামেন্ট করে হাসিমুখে শেষ সৌরভের দৃষ্টি দিয়ে ফেরে অভি। পেছনে পেছনে দয়াশঙ্করকে দেখে অভিজিৎ বলে,

--- ফোরস্টার।

-- তাতে কী হয়েছে?

--- না তোমরা তো আছ ফাইভে। তবে পিয়ারলেসএর ফুড দারুণ।

--- না না পিয়ারলেসও চার, কিজানি তিনও হতে পারে । কিন্তু ভাই অভি আমরা তো দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব ডেস্টিনেশন। কোথায় বসব, খাব এসব?

--- হবে হবে। প্রথম যাব দেউলটি, রূপনারায়ণের পারে রিসর্ট আছে, ওখানে ব্রেকফাস্ট। কাছেই শরৎচন্দ্রের বাড়ি সামতা গ্রাম।

ঘুরপথের পরিকল্পনা শুনে রাই আপত্তি জানায় ।

--- সে তো বুঝলাম অভিদা, উল্টো পথ হয়ে গেল না?

--- তা তো হল। প্ল্যানিং তোমার বন্ধুর।

--সোহাগের সবতাতে পাকামি। শক্তিগড়ে থামব না ? ল্যাংচা?

--- যাওয়ার সময় হবে ।

ওদের কথোপকথন শেষ হলে সোহাগ অভির লুই ফিলিপ স্যুট এর মসৃণ হাতা খামচে ধরে মিঠে ছুরিতে টান দেয়, যাতে অন্যরা বুঝতে না পারে। বলে,

--- মেয়েটার বুকে কী শুঁকছিলে?

অভিজিৎও তৎপর জবাবে জানায়,

--- চালসে হওয়ার পর কাছের জিনিষ ভাল দেখি না, পাওয়ার তিন। নাম পড়ছিলাম, নামে ডাকলে রেসপন্সটা ভাল হয়। শ্বেতার ফিগারটা কিন্তু দারুণ।

--- আর অলিভিয়ার?

--- ও তো টপ পরা।

--- এরকম প্যাশনেটলি আমাকে দেখেছ কখনও?

--- তোমাকে দেখব বলেই তো ওদের দেখি।

--- দেখ, না হামলে পড়।

--- না ম্যাডাম, তুমি আমার শূন্যবুকে নৃত্যময়ী তুমি যে আমার অচল সিকি।

--- ওসব ভাবের কথা। সত্যি বলছ, ভালবাস?

ভালবাসার কথাটা রাই হঠাৎ এসে শোনে ফেলায় সোহাগ থামে।

রাই-সোহাগের গসিপ না হলে চলে না। ভ্রমণের ইটিনিনারি তছনছ করে শৌচালয় যাওয়ার অছিলায় শক্তিগড়েও নামে অভিজিৎ। ল্যাংচার সাইজ দেখায় দয়া ডাক্তারকে, মাঝে মাঝে দুএকটা খায়ও দুই পেটুক। ওদের পেছন ঘুরার কোন মানে হয় না তাই সোহাগ রাইকে টানে। বলে,

--- কুছতো গড়বড় হ্যায়। আমি ভেবেছি আমার কপালেই ওরকম, এখন দেখছি দয়াদাও কম যায় না। আমি ওদের যত বলছি ল্যাংচা প্যালেসে যাও, ওরা বলেছে ল্যাংচা হাউসটা বিশাল, কোয়ালিটিও ভাল, ডাক্তার দয়া তো এর আগে এদিকে এসেছে বলে শুনিনি।

---আমিও শুনিনি, তবে ইদানিং পূর্বজন্মের স্মৃতিকথা বলে।

--- দেখ না কেমন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মেয়েগুলোর সঙ্গে হাসি মস্করা করছে, সাইজ দেখাচ্ছে, উফ্। তবে ডাক্তারবাবু তো আমারটার মতো ইডিয়ট নয়, কথা বলছে না জরিপ করছে।

--- বুক মুখ পশ্চাৎ। কী করবে বল, শিলচরে তো সুনাম রক্ষা করতে হয়। হাইওয়েতে এসে ছাড়া গরু।

--- তুই সাপোর্ট করিস? রিরি করে না গায়ে, মনে হয় না কষে লাগাই?

--- আমার তো মনে হয় ছেড়ে চলে যাই।

--- যাস না কেন?

--- পটাতে জানে, বলে ভালবাসে।

--- তখনও তোকে বলেছিল ভালবাসে। ঝুট।

--- মানে?

--- অভিদা কী ন্যাকা কথা বলতে পারে রে টেলিফোনে।

--- কোথায় শুনলি?

--- তোকে ফোন করে নাকি?

--- মোবাইল ধরার পোজ দেখেই ধরতে পারি, এমনি এমনি পাছাভারি হয় নি। তুই কফি করতে গেলি সকালে, একটি মেয়ে। মেয়েটিকে বলছে ন'তলার ব্যালকনি থেকে কলকাতা দেখতে কী সুন্দর।

--- সুন্দর বলেছে?

--- না, বলেছে মনোরম। বলল তোমার গলাটা ভারি লাগছে কেন? ঠাণ্ডা লাগিয়েছ? কড়া করে চা খাওয়ার পরামর্শ দিল।

--- ধুর, ও তো সুব্রত, ওর জুনিয়র, মেয়েদের মতো গলা।

--- আমি চিনি না? দেখিস কেস আছে, রাই মিশির ন'তলা থেকে পাখির পালক গুণতে পারে।

সুলতান সব চেনে, পাকা ড্রাইভার। শান্তিনিকেতন যে তার চেনা জায়গা বুঝাই যাচ্ছে। কাউকে কিছু না বলে তো বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তাও অভিজিৎ একবার জেনে নেয়,

--- কোন দিকে যাবে সুলতান, বর্দ্ধমান দিয়ে তো?

--- হ্যাঁ স্যার গুসকরা দিয়ে যাব। শর্টকাট হবে, পানাগড় দিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ৫০ কিলোমিটার বেশি, তিনটে বেজে যাবে।

--- খড়িমাটি হোটেল কোথায় জান?

--- জেনে নেব স্যার, শান্তিনিকেতন ডানদিকে হোটেলটা শুনেছি বাঁদিকে। হাইওয়ে থেকে কখন যে শালবনের ভিতর ঢুকে গেছে গাড়ি, কয়েক মাইল চলেও এসেছে শুকনো পাতায়।

দয়াশঙ্করের হিসি পায় না গাড়ি থেকে নেমে দেখার ইচ্ছে হয় কে জানে , সে রাইকে সংকেতে জানায় ইচ্ছে, রাইও সুলতানকে গাড়ি থামাতে বলে। এই ফাঁকে সবাই নেমে যায় শালবন দেখার আনন্দে। হঠাৎ সুলতান আতঙ্কিত হয়ে বলে,

--- গাড়িতে উঠুন তাড়াতাড়ি।

বেচারি দয়া বিড়ম্বনায় মাঝামাঝি থামিয়ে গাড়িতে ওঠে। ব্যস সুলতানের মুখে এবার স্বস্তি, গাড়ি পিছিয়ে নেয়, দেখায় পথের পাশে এক শুকনো সর্পচর্ম। সবাই ভয় পায় আবার, যদিও দয়ার রাগ কমে না। বলে,

--- তুমিও না সুলতান, কী ভিতু! এখন শীতকাল ওরা বেরোয় না।

অন্যরা কিন্তু সমবেত জানায়,

--- তাও বাবা।

সোহাগের মনটা একটু দমে যায়। শান্তিনিকেতন বেড়াতে এসে এতদূরে থাকা, কোন মানে হয়। তবে সরাইখানাটি খাসা। গাছগাছালি ফুলে ফলে ঘেরা কী প্রশস্ত খাওয়ার ঘর খোলামেলা। হোটেল ভেতরে। ওয়াও, স্যুইমিং পুলও আছে, এত এত হরিণ, ক্যাম্প ফায়ারের ধুনিও আছে। দয়া ডাক্তারের চয়েস আছে। তবে শান্তিনিকেতনের আটপৌরে রতনকুঠির কাছে কিছুই নয়, সরকারি কাজে থেকেছে অভিজিৎ । পূর্বপল্লী অতিথিশালায়ও থেকেছে সোহাগ। সোনাঝুরিতে থেকেছে অভি-সোহাগ। রাই আর দয়াশঙ্করের চোখে সবই নতুন। হোটেলের রুম সার্ভিস এ খেতে চাইল না দুই পুরুষ। অভি বলল,

--- আ! বেগুন ভাজার সাইজ দেখে প্রেমে পড়ে গেছি।

রাই টিপ্পনিতে বলল,

-- রুমে এলে কি সাইজ ছোট হয়ে যেতো অভিদা?

--- তা নয়, তোমরা না হয় একটু রেস্ট নিয়ে এসো, আমরা মেনু ঠিক করি, আধঘণ্টা তো লাগবে।

সোহাগ চেনে তার মালখোর বরকে, এখন নতুন বন্ধু দয়াশঙ্করকেও বশ করে নিয়েছে। বুঝতে পারছে কিছু একটা আছে আঠা। হয় মদ নয় নারী। প্রথমটাই হবে। রাইও বলল,

--- আমি শিওর মদ খাবে। কিন্তু বার তো দেখলাম না।

--- তুই ওদের চিনিস না। দয়াদাও অভির ব্যাগ এর ড্রিংকস এখন খাবে না, এখন খরচ করবে দুহাতে, শিলচরে তো শুধু রোজগার। আর আমার জনও যে কোন রসে মজেছে ধরতে পারছি না।

--- ফোন করছে না তো?

--- সে কি আর থামে, ওর চাকরির তো ছুটি হয় না।

--- ওরে ভোলুরাম এত ভোলেবাবা হইও না, তুলেমূলে যাবে বলে দিচ্ছি।

খাওয়ার জায়গা যত সুন্দর, ড্রিংকস এর ব্যবস্থা ততোধিক খারাপ। একটা ছোট এসিরুম, লুকিয়ে খেতে হবে। একটা করে করোনা এক্সট্রা লেজার মেরে বাইরে আসতেই বাঘিনীর মুখে। ঢুলুঢুলু মুচকি হাসিতে টেবিলে বসে তো অবাক, ওরা খাবার অর্ডার দেয় নি, তাহলে। ধবধবে ফুঁইফুলের মতো কোহিনূর চালের ভাত, পাহাড়ের উপর বিশাল বেগুন ভাজা। ঘি, সুক্তো, সোনামূগের ডাল। অভিজিৎ মুগ্ধ চোখে বলে,

--ম্যাজিক।

ইলিশ চিংড়ি চিতল মাছের মুইঠ্যা আর খাসির মাংস দেখে ডাক্তার দয়া বলে,

--এতো?

কেলিন ওয়ার্থের খাবারের অর্দ্ধেক পড়ে আছে গাড়িতে সুলতানের জিম্মায়, দয়াশঙ্কর বলেছে, খেলে খেও। বলে ভোজন দক্ষিণা দিয়েছে পাঁচশ টাকার নোট। খাওয়ার পর সুলতানকে পাঠিয়েছে বোলপুর পান আনতে। সুলতান ফিরে এসে বলে,

--- পৌষ মেলায় যাবেন তো ?

সোহাগ বলে,

--- কোথায় মেলা? শেষ হয়ে গেছে কাল।

আফশোষ হল।

--- তাহলে কী করা যায়, কোথায় যাবে?

ডাক্তার সোহাগকে প্রশ্ন করে। অভি বলে,

--- আমি আর নাড়তে পারব না এখন। শপিং টপিং করে নাও তোমরা। শাড়ি বাটিক ব্যাগ স্যুভেনির।

সুলতান মুখের উপর কথা বলে না। ঠিক সন্ধেবেলা নতুন মেলার মাঠে নিয়ে যায়। মেলা শেষ হয়ে গেলেও ভাঙা মেলা তো আছে।

একেবারে গ্রামীণ মেলা, কিন্তু এতবড়। মেলার মাঠে জিলিপি বাদামভাজা, হাওয়া মিঠাই, কী নেই, হাতাখুন্তি খেলনা শীতের কাপড়। দয়াশঙ্কর মেলার এ মাথা থেকে ও মাথায় ঘুরে বেড়ায় রাই এর হাত ধরে। কিছু খুঁজছে, হারানো কিছু যেন ফিরে পেয়েছে। সে তার যৌবনের গল্প করে যাচ্ছে একা একা, রাই এর হাত ছুঁয়ে। অভিজিৎ সোহাগও শুনছে। দয়া আপনমনে বলে,

--- ডাক্তার হওয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না, শান্তিনিকেতনে পড়ব বলে চলে আসি তবলা দুটো ঝোলায় ভরে। একটা হোটেল অভিজিৎ, বনবানী, হোটেলও নয় বাড়িও নয়, মালিক সৌমেন গুহ ঠাকুরতা। আমাদের কেন যে থাকতে দিলেন, পিলু আর আমি, মানে বিপুল শঙ্কর ভৌমিক, আমার বন্ধু, দুজন এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, তিনমাস কাটিয়ে গেলাম অমিতা সেন এর প্রতিবেশি হয়ে, জানি না। ট্রেনে এসেছি ট্রেনে গেছি, জানি না কোথায় আছে হোটেলটা, এতদিনে তো সব পাল্টে যাওয়ার কথা। সোহাগ বাদাম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলে,

--- সুলতান বলেছে, বাংলার সব পাল্টে গেলেও শান্তিনিকেতন পাল্টায় নি।

অভিজিৎ বলল,

--- যাক শান্তিনিকেতন এসে একটা কাজ তো জুটল। দয়াকে বনবানী ফিরিয়ে না দিয়ে আমি খড়িমাটি ছাড়ছি না বলে দিলাম।

রাই সোহাগের কোমরে চিমটি কাটে। বলে,

--- খড়িমাটির মেয়ে গুলো কালো হলেও স্বাস্থ্যবতী, জহুরি বটে অভিদা, বলছে হোটেল ছাড়বে না।

কাজের মেয়ে রানীর জন্য দুশো টাকা দিয়ে চাদর কেনার পর থেকেই সোহাগের চোখে জল। বড় কেরোসিনের কুপির মতো গ্যাসের আলোয় চোখ জ্বালা করে। সোহাগ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওরা তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে আসে। খড়িমাটির রুমগুলি বেশ বড়, রাই বলে,

--- আমরা এক ঘরেই তো থাকতে পারি।

সোহাগ বলে,

--- না রে আজ পারব না। ট্রিপটা নষ্ট করব না । সুস্থ হয়ে নিই, কাল থেকে তো যেমন ইচ্ছে। তখন একসাথে।

সোহাগের মনে উচাটন। সবাই বলে অভির কথা, অভি মেয়ে দেখলেই আকর্ষিত হয়। এতে সোহাগের কিছু হয় না, বরং দেখেছে বাইরের আকর্ষণ তাকে ঘরের প্রতি আকৃষ্ট করে বেশি। ওদের কাছে পাওয়ার কল্পনাও করে না তার ভিতু স্বামী। কিন্তু ইদানীংকার কানুঘুষোটা ভিন্ন। অভিজিত কোন একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি কথা বলে সর্বক্ষণ। বলে অফিসের কাজে। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সোহাগ কখনও ভাবতেও পারেনি অভিজিত সিরিয়াসলি কোন মেয়েকে নিয়ে ভাবে, ভাবতে পারে। সোহাগ জানে ওদের সম্পর্ক নিয়ে ঈর্ষা করে অনেক কাছের মানুষ। সোহাগের মন মানতে চায় না, অভিকে কখনও একান্ত কথা কারো সঙ্গে বলতে শুনেনি। বাড়ি থেকে বেরোলেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে। বোম্বে দিল্লি গেলে পারফিউম আনে ডিজাইনার নাইটি আনে। বোম্বের কলিগ নাগচেতনের বউ কথায় কথায় দুটো নাইটি কেনার কথা বলে সন্দেহ ঢুকিয়েছিল মনে, একটাই তো এনেছে। এরকম প্রমাণহীন অনেক তথ্য অনেকে তার কানে দিয়েছে। ভারি হতে হতে বিমর্ষ হয়ে থেকেছে, কিন্তু অভিজিতএর কোন হেলদোল নেই, যেমন ছিল তেমনই আছে, তার প্রিয় একান্ত। এখনও বর্ষার রাতে ব্যালকনিতে ওকে জড়িয়ে গায় অতুলপ্রসাদের গান। এত স্ট্রেস সহ্য হচ্ছিল না, কেমন এক সন্দেহজনক শীতলতায় আক্রান্ত হচ্ছিল সোহাগ। তাই একটা আকাশ চাইছিল একা একা। শান্তিনিকেতন ওদের প্রিয় জায়গাও বটে। তবে রাইকে নিয়ে তার সমস্যা নেই, রাইকে তো স্কুলকলেজ জীবন

থেকেই চেনে, বন্ধুরা বলে ক্লোন কপি। কাউকে তো বলতে হবে মনের কথা, যদি দরকার হয় রাইকেই খুলে বলবে মনোব্যথা। দয়াদাও কুচুটে মানুষ নয়, অভির বন্ধু হয়ে গেছে মাত্র দুবারের দেখায়। তবে রাইও মাঝে মাঝে আনতাবড়ি কথা বলে, সোহাগের রাগ হয়। তখন হোটেলের কালো মেয়েদের কথা বলায় ওর রাগ হয়। শুধু অভির কথা কেন বলল। ওরা তো এডাল্ট ভ্রমণেই এসেছে, ডাক্তার বলে কী দয়াদা গাছের গোটা। চোখ জ্বালাটালা কিছু নয়। রাগে শরীর খারাপ হয়। অভির সঙ্গে খুব একলা থাকার সাধ হয়। তাই তাড়াতাড়ি রুমের দিকে পা বাড়ায়। যাওয়ার আগে রাইকে বলে,

--রুম সার্ভিস বলে দিস।

দয়াশঙ্কর অভিজিতকে ঈশারায় থেকে যেতে বলে। সোহাগ বলে,

--- তুমি থেকে যাও ওদের সঙ্গে। হ্যাঁ রে রাই, ও থাকুক, বাট হেণ্ডেল উইথ কেয়ার।

সোহাগ জানে উল্টো কথায় কাজ হয় তার গৃহপালিত প্রভুর। দয়াশঙ্করকে কাটাতে ওর পরিচিত অনুরোধের মুদ্রায় তর্জনী তুলে অভিজিত বলে,

--ওয়ান আওয়ার প্লিজ।একঘন্টা বিবিসেবা করে ফিরছি।

সোহাগের উত্তেজনা হলে ভুল ভাল হয়। লক কার্ড উল্টো ঢুকিয়ে বিরক্ত হয়ে অভিজিতকে দেয়, দরজা খুলেই জাপটে ধরে চকাশ করে স্বামীকে দেয় এক চুমু। অনেকক্ষণ পর শ্বাস ফেরাতে মুখ খুলে বলে,

--- ইউ লাভ মি?

অভিজিত তার ভুবনমোহন মুচকি হাসি বিকশিত করে। সোহাগ আবার বলে,

--- বলো, ভালবাস কি না?

--- ও, ইয়েস।

বলে অভিও নিবিড় হয়।

--- ওকে, তাহলে চলো।

--- চলো। কোথায় যাবে এই রাতে?

--- রাত কোথায়? এখন চান করব, ড্রেস করব, তারপর তো। কী পরব বল, টুনাইট ইজ ইওরস, সে।

--- ঘরে তো রাতের পোষাকই পরবে।

--- নো, মনে করো বাইরে যাবো। রুবিকন পরব? পিচ কালারটা? অফ শোল্ডার?

-- ওহ নাইস। কোল্ড শোল্ডার এনেছ? পি কা বু। একটু বডিহাগিং হলে ভাল লাগবে।

--- গট ইওর পয়েন্ট, মোটা হয়েছি? আর তুমি কী পরবে? ওরেঞ্জ প্রিন্টেড শর্ট এনেছি, ফুল স্লিভ হেনলে টি-শার্টটা পরবে?

--- ওকে ম্যাডাম।

--- দুঘণ্টার জন্য হারিয়ে যাব আমরা। ওয়ান আওয়ার গ্রেস টু ডক্টর দয়াশঙ্কর।

সুলতানকে ডিনারের জন্য পাঁচশ টাকা নাচিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওরা নৈশ অভিযানে। শান্তিনিকেতন ওদের চেনা জায়গা বলে প্রান্তিক পৌঁছে যায় পাঁচ মিনিটে। প্রিয় সোনাঝুরি ক্লাব এর নিরিবিলিতে। একই আছে দক্ষিণের জানালা। সামনের আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে ইস্টিশনের দিকে। শুক্লপক্ষের চাঁদ আর ভেপার আলোয় কাঁচের জানালা কথা বলে। ইচ্ছে না হলেও হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ড্রিংকস এর ব্যাপারে সোহাগ অভির উপর কথা বলে না, তাই রাজকীয় ঢংয়ে বসে দুটো হাই বল দিতে বলে। কিন্তু সোহাগের মন আজ শুধু স্কচ আর সোডায় মানছে না। সামান্য পরিবর্তন চেয়ে বলে,

--- একটু লুকোচুরি হোক না। ভোদকা উইথ লাইম?

অভিজিত উদারতায় মুক্ত হস্ত। বলে,

--- না হয় তাই হল। কিন্তু এই গন্ধ বিধুর সমীরণে কেন নির্গন্ধ হতে চাইছ বউ?

--- রবিঠাকুর আছেন না পথ রুধি? তাঁর বাড়ির উপর দিয়ে ফিরতে হবে যে।

--- আর ইউ শিওর ম্যাডাম?

--- কী?

--- তিনি খেতেন না?

--- কী জানি? ঠাকুর হয়েছেন যখন ও ব্যাপারে সন্দেহ না রাখাই ভাল। আচ্ছা, বললে না তো হাও আই লুক?

--- এক দু পাত্র চড়ুক, একটু বিবশ হই।

--- বিবশ! রাইট ওয়ার্ড। এর জন্যই না তুমি একমাত্র। ওনলি ওয়ান। তুমি কার সঙ্গে এত কথা বল? বল তো?

--- হঠাৎ।

--- তোমায় সন্দীপের কথা বলিনি?

--- তোমার লাভার বয়।

--- আমাকে দেখত আর প্রশংসা করত।

--- আমি পারি না।

--- মুখে বলতে হয় না, বডি টক।

--- কথা বলে কতটুকু হয়, মাত্র সাত শতাংশ, বেশিটাই শরীর ভাষ্য।

--- তোমার পুরুষালি ব্যাপারটা দারুণ। চোখ মুখ মাংসপেশী কথা বলে। তোমার ড্রেস, কেন যে সিগারেট ছেড়ে দিলে।

--- বাট ডোন্ট রেজিস্ট মি টুনাইট টু টক। ইউ আর জাস্ট র‍্যাভিসিং।

--- বুড়ি হয়ে গেছি বলছ।

--- নো---ও। একটু ফ্ল্যাবি। ওটাও একটা রূপ। আর এই পরিধানও তোমার শরীরকে চায়।

কথা না বলার কথা বলে ওরা অনেক কথা বলে। কথা বলা শেষ করে ওরা মুখোমুখি বসে থাকে। পেখম মেলা সোহাগ অভির দিকে তাকায় না। কাঁচের জানালা দিয়ে নীচের মায়াবি আলোর আঁধার দেখে। সোহাগ চাইছে তাঁর বর তাকে দেখুক অপার্থিব একান্ত সুন্দর পরিবেশে। ফিরে পেতে চাইছে তার রহস্যময় মানুষকে। দু পাত্র শেষ করে ওরা নীরবে। সোহাগ মুখোমুখি থেকে অভিজিতকে কাছে ডাকে। বলে,

--- তুমি তো শুনেছি তোমার তোমার অফিসের রবিন হুড। কত কিছু করতে পার। --- বাড়িতে কী আমি হিটলার?

--- হলে তো ভালই ছিল, তুমি এত কেয়ারিং? অন্যরকম ভাবতেই পারি না। রাই আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড, সব কথা বলতে পারি না ওর সঙ্গে, দম আটকে আসে। তুমি কি জানো আমি কত একা। কতক্ষণ আর একসঙ্গে থাকি আমরা। তুমি তোমার ইমেজ বাঁচাতে অফিস অফিস কর বাড়িতেও। ফোনে কথা বল।

--- ইন্সট্রাকশন থাকে কতরকম।

--- গভীর রাতেও ইন্সট্রাকশন, আজ সকালেও কথা বলেছিলে।

--- কখন?

--- বেরোনোর আগে।

--- সুব্রত, তুমি চেনো।

--- রাই বলল মেয়ে।

--- তোমার বন্ধুটি কি সিআইডিতে কাজ করে?

--- ব্যালকনি থেকে কলকাতার দৃশ্য বলছিলে, তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে বললে।

--- মধুমিতা। সুব্রতর স্ত্রী।

--- তোমার সব ভাল। মেয়েদের প্রতি অগাধ কৌতূহল ভাল। ছোঁকছোঁক ভাল। সব কথা যে বলে দাও সেও ভাল। কার বাস্টলাইন সুন্দর, কার পাছা... ধুর চড়ে গেছে দেখছি। ইদানীং

কেন মনে হচ্ছে তুমি ভার্চুয়াল থেকে রিয়েল হয়ে যাচ্ছো, যেন কেউ আছে, আমি হেরে যাচ্ছি আমি কি তোমার লাভ ইন্টারেস্ট নই আর? ফ্ল্যাবি হলে সেক্স ইন্টারেস্ট থাকে না? চলো, ওরা অপেক্ষায় আছে। ফিরতে ফিরতে একটা গান গাইবে?

--- গাইব। আজ হু হু হু।

--- বা, জ্যোৎস্নারাতে আমাকেও গাইতে হবে।

ঝড়ের বেগে শান্তিনিকেতনের ধারা বিবরণী শুনিয়ে যায় সোহাগ। আসলে বাল্যবন্ধুকে জ্ঞান দিতেও একটু ভয় ভয়। দয়াশঙ্কর ডাক্তারের সামনে কী বলতে কী বলে ফেলবে। খুব রহস্যময় মানুষ। বলছে ওরা প্রথম এসেছে, রাই ঠিকই বলেছে, দয়াশঙ্কর নিজেকেই অস্বীকার করছে। বলছে বনবানী হোটেলে ছিল তিন মাস। তাও রাইকেই বলে দেবেন ঠাকুরের কুড়ি বিঘা জমির ইজারা নেওয়ার কথা। মহর্ষির শান্তিনিকেতন নামে ভুবনডাঙার অতিথিশালার নির্মাণকথা । রবীন্দ্রনাথের বাড়ি উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের ভিতর উদয়ন কোনার্ক শ্যামলী পুনশ্চ আর উদিচি বাড়ির কথা। ওদিকে নতুন বাড়ি দেহলি আম্রকুঞ্জ ছাতিমতলার ব্রাহ্মমন্দির। মাটি ভাঙা খোয়াই এ মেলা বসে সকাল থেকে। এগিয়ে গেলেই কোপাই নদী। শ্রীনিকেতন ছাড়িয়ে আমার কুঠিতে বাটিক সিল্ক আরও নানান ধরণের শাড়ি। ঘর সাজানোর সামগ্রী। বিশ্বভারতীর ভিতরে শুধু ভবন। চিনা হিন্দি নিপ্পন সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা বিনয় পাঠ আর সবার সেরা কলাভবন। রামকিঙ্করের বিখ্যাত কলের বাঁশি সাওতাল পরিবার বুদ্ধ আর সুজাতা।

--- উত্তরায়ণ বুধবার বন্ধ বলেই আমরা বৃহস্পতিবার এসেছি।

সোহাগ দেখাতে দেখাতে মন্তব্য করে।

--- বুধবারে এলেও ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হতো না।

সেমসাইড টিপ্পনি কাটে আবার সোহাগ।

শান্তিনিকেতন এসে অমর্ত্য সেন এর বাড়ি দেখা হবে না, এ হয় নাকি। তার উপর অভিজিত যখন কথা দিয়েছে দয়াশঙ্করের লুপ্ত সরাইখানা বনবানী ফিরিয়ে দেবে। শান্তিনিকেতনের সব বাড়িই প্রায় যেমন ছিল তেমন আছে। রবীন্দ্রনাথ এলেও চিনতে অসুবিধে হবে না। বনবানীও পাওয়া গেল, সংকেত ফলকটি একই আছে, ছোট দোতলা বাড়ির সিঁড়ি

ঘরের অফিসে নাকি হুবহু ওরকম বসে থাকতেন সোমেন কাকু। এখন অন্যজনও অনেকটা উনার আদলে। দয়াশঙ্কর লোকটাকে বলল,

--- দুই ছেলে খুব উৎপাত করত, তবলা বাজাতে হত তাকে, কী দারুণ গাইত দুভাই।

লোকটি হাসে, বলে,

--- আমি বড়, ছোটটা এখন বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক বনবিহারী গুহঠাকুরতা।

বনবিহারীর নাম শুনে রাই সোহাগ এর মুখ উজ্জ্বল হয়, দয়া ভাবলেশহীন। বনবানী আবিষ্কারের ধাক্কা এখনও সামলাতে পারে নি, অভিজিত তৎপর হয়ে বলে,

--- চা খাওয়া যাবে? কিংবা প্রাতরাশ?

--- না, এখন আর আবাসিক থাকে না, বোলপুর স্টেশন রোডে চলে যান , অদ্বৈত হোটেলে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব পাবেন।

সোহাগ হাল ছাড়তে রাজি নয়, বলে,

--- তাহলে হোটেল খোলা রেখেছেন কেন?

--- এখন বাড়ি। বাবার আমলের আদলটা রেখেছি।

--- ও, তা বনবিহারীর ক্যাসেট পাওয়া যাবে?

--- না। সুবর্ণরেখায় পাবেন, রতনকুঠির কাছেই।

অভিজিত তাও নাছোড়বান্দা, বলে,

--- বাথরুম যাওয়া যাবে?

লোকটা আর না করে না, ঐ দূরে বারান্দা দেখিয়ে দেয়। রাই আবার সোহাগের জামদানির আঁচল ধরে টানে,

--- বুঝলি তো দুই পাগলে চিবিয়ে খেয়েছে এক পাগলের মাথা। চল পালাই।

ছেড়ে দেওয়া আঁচলটা আবার সজোরে টানে রাই, বলে,

--- আমি বেট ধরে বলতে পারি ঐ মেয়েটিই।

--- কোন মেয়েটি?

--- যাকে নতলা থেকে কলকাতা দেখিয়েছিল অভিদা। ঐ দেখ মোবাইল কানে।

দুদিন তো ভালই কাটল। রাই দয়া তৃতীয়বারের জন্যও পাকা কথা দিল, আসছে বছর আবার হবে । তবে অন্য ভেনু, ঠিক করবে অভিজিৎ। বনবানীর বাথরুম থেকে ফেরার পর অভির মোবাইল চেক করেছে সোহাগ , রাইর ধারণা ভুল, সুব্রতকেই ফোন করেছে অফিসে। রাইটার সব ভাল, কিন্তু ছোট থেকেই মানুষের পিছনে লাগার, গোয়েন্দাগিরি করার অভ্যাস গেল না। তাই রাইকে তার জয়ের খবর জানাতে ভোলে না। রাইও খুশি হয়ে বলে,

--- যাক। তবে বন্ধু, শত্রুকে দুর্বল ভাবিও না। তইকিকাত জারি রেখো । রাই মিশ্রর এত ভুল হয় না, এমনও হতে পারে কথা বলেই হিস্টরি ডিলিট করে দিয়েছে, সুব্রতকে একটা ফলস রিং করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কিংবা সেই বৃন্দাবন বিলাসিনীর মিথ্যে নামই সুব্রত।

--- সে আমি কল করে দেখেছি, সুব্রতদাকে চিনি।

--- তাহলে আর কী, মনকলা খাও।

সোহাগ বিশ্বাস করে রাইর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ। জিরো ফেইলার। তাই ন'তলার ফ্ল্যাটে ফেরার পর অভিজিৎ এর দেখাশোনা খাওয়া দাওয়ার উপর তীক্ষ্ণ নজর দেয়, সব নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। স্বামী সেবা হয়, কিন্তু কিজানি কি একটা হারিয়ে ফেলে সোহাগ। সুখের নাকচাবিটা হারিয়ে যায় হলুদ বনে। যদিও অভিজিৎ এর সুখ হয় এসবে , মোবাইলে কথা বলার সময়ও যায় বেড়ে। এখন আর সে স্বাভাবিক ভাবেও কথা বলে না ফোনে, ফিশফিশিয়ে বলে। সোহাগ আড়ি পাতে না, এমনকি মোবাইলও চেক করে না। ওদের বিবাহবার্ষিকীর দিনও যখন টেরেসে গিয়ে ফিশসিশ করল অভিজিত, তার পরদিনই একটা কাজ করলো সোহাগ, ভোডাফোন স্টোরে অভির সই নকল করে একটা কললিস্ট চেয়ে চিঠি দিয়ে এল, এখন অপেক্ষা কললিস্টের। বলেছে দুদিনেই হার্ড কপি পৌঁছে যাবে।

বুদ্ধিটা কিন্তু তার নিজের। যদিও জানে না কললিস্ট আনিয়ে সে কী করবে। সত্যি সত্যি কি কোনও ঘুণপোকা আছে কোথাও। থাকলেও দুদিন অপেক্ষায় থাকা যাবে না। এর চেয়ে ভাল অভির সইটা আবার নকল করে বলে দেওয়া, লাগবে না।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ, সঙ্গেসঙ্গে ডাটসুন গো র চাবি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সোহাগ সিটি সেন্টারের দিকে।

নিভৃত ছায়া



স্থায়ী ঠিকানা

আমার বাবা খাস সিলেটি।

সিলেটি তো বুঝি, বাংলাদেশের একটি জেলা সিলেট, সেই জেলার আধিবাসী হলেই সিলেটি। খাস যোগ করলে নাকি সিলেটি ভাষার অকৃত্রিম রূপের কথক বোঝায়। বাবা বুঝিয়েছে, আমি বুঝি নি। আমার জন্ম শিলচরে, মামার বাড়িতে ১৯৮৩ র দুসরা মার্চ। দুমাস বয়স হতেই চলে যাই বাবার কর্মক্ষেত্র ডিব্রুগড়ে। বাবা ব্যাঙ্কের কর্মচারি। প্রথমে ছিল ক্লার্ক, তারপর পরীক্ষা দিয়ে অফিসার। আসামের অনেক শহরে কাজ করেছে। তৈলশহর ডিগবয় দিয়ে শুরু তারপর গৌহাটি লামডিং যোরহাট শিলচর ডিব্রুগড়। আমি দুবছর ছিলাম আসামে। তার আগে ১৯৮৫ এর ১৫ অগস্ট আসাম আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আসাম সমঝোতা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বাবা। সে বছরই স্বেচ্ছা বদলি নিয়ে চলে আসে কলকাতায় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে। পরে, বড় হয়ে বাবাকে প্রশ্ন করায় বলে আমার জন্য নাকি কলকাতায় আসা। আমি বুঝি নি। বাবা বলে আসাম তার দ্বিতীয় স্বদেশ, অসমিয়া ভাষা বলতে পারে মাতৃভাষার মতো। রাজনৈতিক আসামে দুটি নদী উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র আর বরাক। বাঙালির মুখের কথায় ব্রহ্মপুত্রই আসাম নামে পরিচিত। বরাকে মূলত বাংলা ভাষীদের প্রাধান্য। চাকরিসূত্রে বাবা দুই উপত্যকাতেই বসবাস করেছে, তাই বাবার মুখের কথায় অনেক অসমিয়া শব্দ। বাবা মানে না। বলে আৎরানো মানে সরিয়ে রাখা, সিলেটিতেও আছে, অসমিয়ায় মাকে আই বলে, সিলেটের গ্রামেও বলে, বিষহরি পূজার মনসা ঠাকুরানিকেও বলে আই মনসা। বলে, সিলেট কাছাড়ের সঙ্গে কামরূপ জেলার ভৌগোলিক দূরত্ব বেশি না থাকায় অসমিয়ারাও পর্যন্ত কামরূপের ভাষাকে সিলেটিয়া বলে। এসব কথায় এখন দাঙ্গাবীজের বিতর্ক থাকে বলে প্রকাশ্যে বলে না। বাবা বলে আসামে তাকে তিন রকমের কথ্যভাষার মোকাবিলা করতে হয়। এক অসমিয়া। দুই বাংলার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা এক জগাখিচুড়ি, যা কারো মাতৃভাষা নয়। ঢাকাই সিলেটি চাটগাইয়া নোয়াখালি ময়মনসিংহ কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারো নয়। কলকাতারও নয়। তবে কলকাতা ঢাকার প্রতাপ বেশি, সিলেটি তিন নম্বরে। আর তিনে

সিলেটির খুব দুরবস্থা, রামেও মারে রাবনেও মারে। অসমিয়াদের কাছে সব কন্ডলের ঘটি হল সিলেটি, বরাকের মানুষ। স্বাধীনতার আগে যখন পুরো সিলেট আসাম রাজ্যে তখন তো বাঙালির আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। সিলেটি প্রাধান্য ছিল আসামের রাজধানী শিলং এ, গৌহাটিতেও। আসামের সংখ্যাগুরু হওয়ার প্রবল দাবিদার সিলেটকে পরিকল্পিত চক্রান্ত করে দিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্থানের হাতে গণভোটের প্রহসনে। আর তার পরই আসামের রাজ্যপাল,সাংবিধানিক প্রধান আকবর হায়দরি বলেন, যাক বাঙালি আর ক্ষমতার ধারে কাছে রইল না। এর আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈও আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, আসাম অসমিয়ার। ব্যথিত মহাত্মাজি একথা শুনে আক্ষেপ করে বলেন, আসাম যদি অসমিয়ার ভারত তবে কার। আমার বাবার আক্ষেপ নেই, আছে রাগ। বলে আসামে বাঙালি বিদেশি হলে অসমিয়ারা তবে কী। এরাও তো ব্রহ্মদেশ থাইদেশ থেকে এসেছে।

আমি ওসব বুঝিনি, আসাম নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই কারণ আমি বড় হয়েছি কলকাতায়। বড় হলেও কলকাতা আমাকে খুব একটা ছুঁয়ে দেখেনি। যদিও পড়াশুনার সঙ্গে গান বাজনা নাটক সিরিয়েল করে ফেলেছি বারো ক্লাস অব্দি। বঙ্গসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ঝাঁকিদর্শন। খুব ভাল নয় আবার খুব খারাপও ছিলাম না পড়াশুনায়। যেহেতু কলকাতার প্রতি তেমন টান ছিল না তাই বারো পাশ করেই বায়না ধরি ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার। আমার বয়সি সবাই যেমন করেছে। কারণও একটাই, পশ্চিমবাংলায় শিক্ষার পরিবেশ নেই। তার উপর আমি তো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পাশআউট, ভর্তিটর্তির ব্যাপারেও একটু বৈষম্য হয়। সিবিএসসির আশি নম্বর আর কলকাতার ষাট কে এক বন্ধনীতে রেখে ভর্তি হয়।

কলকাতার প্রতি না থাকলেও, শিলচরে আমার মামার বাড়ির প্রতি একটা টান আছে। একটা আবেগের ব্যাপার, জন্মভূমি বলে কথা। আসলে তাও নয়, আমার ছোট মামার বাড়ি বরাক উপত্যকার এক গ্রামে যেখানে আমার দাদু দিদা ছিলেন। আমার তিন মামা তিন মাসি, একজন ছাড়া সবাই থাকে শিলচরে। ছোটমামার বাড়ি গিয়ে একবার বৃষ্টির শব্দ শুনেছিলাম সারারাত জেগে। ইসপল্টুর টিনে জল তরঙ্গ বেজেই গেছে সারারাত। আমার বাবার বাড়ি ছিল বাজারিছড়া নামে এক গ্রামে। বাবা বলে ওটাও তাঁবু, পরের জমিতে শনবাঁশের বাড়ি। আমার বাবার কোন স্থায়ী আস্থানা হয় নি আসাম দেশে, নিজের কোনো বাড়ি ছিল না। বাবার জন্ম দেশভাগের দুবছর পর, বাবা কিন্তু উদ্বাস্তু নয়। যদিও বাবার পৈত্রিক বাড়ি সিলেটের পাড়াগাঁয়ে।

গ্রামের নাম রাউলি, পরগণা ছাতক। বাবার দাদু চাকরি করতেন মেদলি চা বাগানে এখন নাম পাল্টে হয়েছে শিপানজুরি টি এস্টেট। আমার ঠাকুরদা কিছুই করতেন না, তাই কোন বাড়িঘর ছিল না। ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবন । বাবা বলে উদ্বাস্তু হলেই বা কী না হলেই বা কী, ওরা নাকি জন্ম বেদুইন । দেশের বাড়ি রাউলি এত অনুন্নত যে ওখানে বাস করা যায় না। বাবার অনেক আত্মীয় স্বাধীনতার পর থেকে বরাক উপত্যকায় এবং আসামে এসে বসবাস করেছে। শরণার্থীর সুযোগ সুবিধা জায়গাজমি পেয়েছে। বাবার বাবা ওসব কিছুই করেন নি। কেন করেন নি বলতে পারে নি বাবা, তবে আমাকে মজা করে বলেছে তার বাবা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাঙালি ছিলেন। তিনি যেরকম বলেছেন হুবহু তেমন, তৈলঢালা স্নিগ্ধতনু নিদ্রারসে ভরা, মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার পর আমায় নিশি পায়। নিশির ডাকে পড়াশুনা ছেড়ে দিই। মনি হাজরিকা নামে আমার রুমমেট আসামের মেয়ে, আমাকে অসমিয়া শেখায়। আর দুই বন্ধু মিলে শহর তোলপাড় করি। এক বছর গোল্লায় যায়। পরের বছর পাশ করে ফিরে আসি কলকাতায়। এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিও পেয়ে যাই। কলকাতায় মন বসে না বলে ফিরে যাই ব্যাঙ্গালোর আবার। আবার চাকরি। প্রেমটেম করি কয়েকটা, দক্ষিণ ভারতের সব ভাষাভাষী ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছি, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে হিসেবি থেকেছি। শেষ পর্যায়ে একটি পাঞ্জাবি ছেলে কৃপালকেই বিয়ে করব বলে ঠিক করে ফেলি। নারকেল তেঁতুল আর কারিপাতার গন্ধ থেকে তো মুক্তি। আপাতত থাক আমার প্রেম কথা।

বাবার কথা বলতে গিয়ে এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে। বাবা কেন কলকাতা চলে এল সে কথা তো শেষ করি নি। যখন শুনল ছাত্রনেতাদের সঙ্গে অ্যাকর্ড হয়েছে রাজীব গান্ধির, বাবার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সমঝোতার শর্তে ২৪ মার্চ ১৯৭১ এর পর যারাই আসামে এসেছে সবাই বিদেশি। এ যেন গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমার সকাল আর মধ্যাহ্নের সীমারেখা। যদ্যপি এই যষ্টি দণ্ড ঐ প্রস্তর খণ্ড স্পর্শ না করিবে তদ্যপি সকাল। খুব আনন্দ হয়, খুব উল্লাস আসামে। ছাত্রনেতা প্রফুল্ল মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী ভৃগু ফুকুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আসামের রাজ্যপাট দখল করে। বাঙালিও কেন যেন খুশি হয়। প্রবাদেই আছে গালাগালি খেলে বাঙালির আনন্দের সীমা থাকে না। বাঙালি খুশি, কারণ হয়তো সে সমঝোতার শর্ত নাকচ করেছে মনে মনে। বাঙালি

কিন্তু বাঙালি তাড়ানোর মিছিলে হাঁটে। স্লোগানও দেয়, খেদিব লাগিব মানে তাড়াতেই হবে। স্লোগানকে বিদ্রূপও করে। বলে, বুঝলাম তো, যাইতাম কৈ। কোথায় বিতাড়ন। বাংলাদেশ নেবে না এক পিসও, ধাক্কা দিলেও নেবে না। বুদ্ধিমান বাঙালি বলে, বাচ্চা ছেলেদের বুঝিয়েছে, ওরকম হয় নাকি। এক দেশে দুরকম নাগরিকত্ব, সব কেন্দ্রিয় ধাপ্পা ।বাবা কিন্তু এত সহজে বোঝে নি।

বাবারও এই এক দোষ আমার মতো। এককথায় অন্যকথায় চলে যায়। তাই বাবাকে আবার ফিরিয়ে এনেছি পূর্বকথায়। কেন বলল আমার জন্য ছেড়ে এল তার স্বদেশ আর দ্বিতীয় স্বদেশ। বাবা বলেছে ১৯৭১ যদি ভিত্তিবর্ষ হয় তাহলে প্রমাণ করতে পারবে না অনেকেই। গ্রামের মানুষ কিংবা ছোট ছোট শহরের মানুষ কোথায় নথিপত্র নিয়ে সচেতন। যদিও বা প্রমাণিত হয় নাগরিকত্ব তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণির হয়ে থাকতে হবে। সন্তান সন্ততিরা সরকারি চাকরি পাবে না। ভাল পড়াশুনার সুযোগ পাবে না, একটা বৈষম্য থাকবে। আমার বাবা কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ আউড়ায় বলে তিনিই স্থায়ী ঠিকানা। তিনিই জানিয়েরছেন জাতি বৈষম্যের বিষফল কথা। বলেছেন, জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়, ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।

কলকাতা আসার পর বাবা শুধু ঠিকানা যোগাড় করে গেছে। প্যানকার্ড ভোটারকার্ড অফিসের আই ডিকার্ড রেশনকার্ড। ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়েছে কিন্তু গাড়ি নেই, এখন তো আধারকার্ডও আছে। প্যান ছাড়া সব কটাতেই ঠিকানা। আমি বাবাকে বলি তাহলে আর এত আতান্তর কেন। বাবা মেনে নেয় । বলে চাকরির প্রথম দিনের কথা। ব্যাঙ্কের ডিগবয় শাখার ম্যানেজার কাকতিবাবু বলেছিলেন ফর্ম ফিলাপ করে দিতে। তারপর বললেন পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস। স্থায়ী ঠিকানা বলে তো কিছু নেই। বাবা তখন হতভম্ব। ভাবছে চাকরিটা গেল। নেই স্যার শুনে কাকতিবাবু বললেন দিয়ে দাও কিছু একটা। তখনই মনে পড়ে বাবার পিসির বাড়ির কথা। লক্ষীপুরে নদীর পারে দোতালা বাড়ি। প্রায়ই যেত শিলচর থেকে পিসিমার হাতের রান্না খেতে আর ভাইবোনদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে। বাবা সাহসে ভর করে লিখে দেয় মিছে কথায় তার স্থায়ী ঠিকানা। লক্ষীপুর কাছাড় আসাম। সেই দাগটা খুব খচখচ করে বাবার। আমি বলি সে তো চুকে গেছে। ওটা মুছে গেছে। এখন তো ঠিকানা কলকাতা। মহানগরের নাগরিক।

আমার মুখে মুছে যাওয়ার কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলেছিল বাবা। মুছে যে যায় নি সে কথাটাই বলে। বলে সেই মিথ্যে কেই একদিন সত্য করে তুলেছিল। আমাকে অবাক করে বাবা তখন গল্পের ভেতর নিয়ে এল এক মোচড়। সে এক গল্প বটে। সঠিক কবে বাবার কাছ থেকে শুনেছি মনে নেই। একবারে বলেছে, নাকি কিস্তিতে কিস্তিতে বলেছে কে জানে। কারণ আমার কাছে গল্পটার বাস্তবতা আমার নিজের। পুরোটাই যেন আমি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। তাই বাবার মুখ্য বয়ানে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বলে যাব বাবার স্থায়ী ঠিকানা মুছে না যাওয়ার গল্প। মূল কথক হিসেবে আমিও মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে যাব যাতে বিষয়ান্তরে না যায় কথাবস্তু।

বাবার এক সহকর্মী আই লোরেন্দ্র সিং। সহকর্মী শুধু নয় সহপাঠীও, শিলচর কাছাড় কলেজে একসঙ্গে পড়েছে বি কম। ডিগবয় মিশন পাড়াতে দুইবন্ধু একসঙ্গে থেকেছে বাসা ভাড়া নিয়ে। লোরেন্দ্রকাকু লক্ষীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। বাবা বলে লক্ষীপুর শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মণিপুরি। লোরেন্দ্রকাকুও তাই। বাবা কাকুকে প্রায়ই বলত তার স্থায়ী ঠিকানার কথা। অফিস রেকর্ডে তার মিথ্যে তথ্যের কথা। বলে বলে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। শেষমেশ বলল একটা জমি কিনবে লক্ষীপুরে কমদামে, নদীর পারে হলে খুব ভাল হয়। বাবার মনে তার পিসিদের বাড়ির শৈশবস্মৃতি সৌন্দর্যে তখনও অপরূপ। বাবা বলত, বলতে বলতে হারিয়ে যেত দোতলা বাড়ির অন্দরে। কখনও বাড়ির উঠোনে কামিনী গাছের নীচে। কী আকুল করা ফুলের গন্ধ, বাবার পিসিমা বলতেন কামিনী ফুলের গাছে সাপ থাকে। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে চলে আসে। কখনও ভরা বর্ষার দোতলা থেকে দেখতে কী বিশাল লাগত ঘোলা জলের ফোঁসফোঁসানো বরাক নদীকে। হাত বাড়ালেই যেন নদীর জলে নৌকো। একদিন রাতে মেজদা বলল চল। বৃষ্টির রাতে হাফপ্যান্ট পরেই বেরিয়ে গেল দাদার হাত ধরে মাছ ধরতে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছিল বাবা, শুধু খলুই এগিয়ে দেওয়ার কাজ করেছে মেঘেঢাকা পূর্ণিমার রাতে। মেঘ সরে গেলে, সেকি এক অপার্থিব দৃশ্য জলে। রুপোলী মাছেরা সব উঠে এসেছে নৌকো ঘিরে। ওরকম দৃশ্য আর দেখে নি বাবা। বাবার মনোবাসনা পূর্ণ করে লোরেন্দ্র কাকু একদিন বলল পাওয়া গেছে জমি। নদীর পারে এবং শহর থেকে একটু দূরে। কাকু অর্ধেক, বাবা অর্ধেক দিয়ে কিনে নেয় খুব সস্তায়। এক হাজার করে কাঠা, এক বিঘা জমির জন্য দুই বন্ধু দেয় দশ দশ কুড়ি হাজার। দুজনেই জমি দেখে উকিল কাছারি স্ট্যাম্প পেপারে রেজিস্ট্রি করে চলে এল শুভক্ষণে। জমিটা কিনেছে তাদেরই পরিচিত এক মোগলাই্র কাছ থেকে। বাবা বলেছে মণিপুরি মুসলমানকে

মোগলাই বলে। হয়তো তাচ্ছিল্য করেই বলে। নুরুদ্দিনের এক পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই, জমিটা তার পিসির। অনেক চেষ্টা করেও একটা পিআরসি যোগাড় করতে পারেনি বলে নূর চাকরিবাকরিও পায় নি। বাবা বলে এসব চক্রান্ত, অসমিয়া ছাড়া যাতে আর কেউ চাকরি না পায় তাই শাসকপক্ষীয় চালাকি। আমি বাবাকে বলি নূরউদ্দিন তো বাঙালি নয়। তাতে কী বাবা বলেছে অসমিয়া ছাড়া সবাই বিদেশি আসামে। বাবাকে বলি তো পিআরসি টা কী, কী তার ব্যবহার। খায়, না সাজিয়ে রাখে ফুলদানিতে। বাবা পিআরসি জানে। বলেছে, পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, স্থায়ী ঠিকানার শংসাপত্র। বাবাকে বলি, থাকলে কী হয়। বলে, না থাকলে অনেক ফ্যাঁকড়া। বাবা রেগে গিয়ে মজা করে বলে হাড়মুড়মুড়ি হয়, বাঘে ছোঁয়। বলি, কোন আইন কানুনের বালাই নেই। না, সোজা ডিটেনশন ক্যাম্পে পুরে দেওয়া হয়। ওটা আবার কী। আমার চমকে দেওয়া প্রশ্নে বাবা আবার রাগে। রেগে বলে মুরগির খাঁচা। নুরুদ্দিন পিসির সম্পত্তি বিক্রি করে চলে যায় মণিপুরের থউবালে।

বাবা লক্ষীপুরের জমিটা কিনে খুব তৃপ্তিতে আছে এটা বোঝা যায়। বলে মাঝেমাঝেই চলে গেছে নদীর পারে নিজের জমিতে বেড়াতে। অন্তত যতদিন আসামে ছিল। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে সীমানা নামজারি করিয়েছে। বাবার পিআরসি নেই। বলেছে পিআরসি দিয়ে কী হবে, চাকরিটা তো আছে, নদীর পারের বাড়িটা আছে। আসলে আসাম অ্যাকর্ড হওয়ার আগে ভাবে নি এরকম হবে। বাবাকে বলি তাহলে আর কিনলে কেন জমি। বাবার মাথায় তখন মিথ্যে তথ্য লেখার পোকা। পরের দিকে লোরেন্দ্র কাকুও বলেছে জমিটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। বলেছে নদীর পারের জমির দাম বাড়ে না, কোনও দিন নদীর গর্ভে চলে যাবে। বাবা বিক্রি করবে না, কাকুকেও বিক্রি করতে দেয় না। কাকু বাবার জমি দেখাশোনা করে। বাবাকে বাঁশ বিক্রির টাকাও দিয়েছে একবার। এখন আর দেয় না। জমিটাতো দেখাশোনা করে, এতেই খুশি বাবা। বলে বেড়াটেড়া দিতেও খরচা আছে। কাকু খুব ভাল মানুষ, আমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেও থেকে যায়। বাবা বলে রিটায়ার করে দেশে গিয়ে বাড়ি করবে, থাকবে। আমি যে ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে কোথাও যাব না এনিয়ে বাবার একটা মনোব্যাথা আছে। এটা তো ঠিকই ভারতের বড় শহর গুলির মধ্যে ব্যাঙ্গালোরের আকর্ষণ ভিন্ন। এমন নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ভারতের কোন বড় শহরে নেই। তাইতো বলা হয় ব্যাঙ্গালোর পেনশনভোগীদের স্বর্গ, বলা হয় বাগাননগর। বাবাকে বলি অবসর গ্রহণের পর কর্ণাটকে চলে আসুক, আর একটা স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যাবে। তবে লক্ষীপুরের জমি নিয়ে বাবার আবেগ দেখে

আমিও দুম করে মত বদলে ফেলি। বলি থাকব না গার্ডেনসিটিতে। আমার জন্মদেশে চলে যাব। শিলচরে থাকব, মাঝেমধ্যে যাব বাবার সঙ্গে লক্ষীপুর ।

আবার ফিরে আসি আমার প্রেমপর্বে। এতসব হেতু আমার সামনে, কোনটা রাখি কোনটা ছাড়ি। নাগরিকত্ব নিয়ে আসামের এই সমস্যা আমাকেও জর্জরিত করে ফেলেছে। এক অপমান এবং পরাজয়ের মুখোমুখি। একটা লড়াই করারও দরকার। আমি কলকাতায় থাকি বা ব্যাঙ্গালোর থাকি আমার শেকড়টা তো বরাক উপত্যকায়। আমার বাবার তাঁবুবাড়ি বাজারিছড়ায়, আমার মামার বাড়ি শিলচর এবং ভুবনগ্রামে আর লক্ষীপুরে আমার বাবার স্থায়ী ঠিকানার জমি। ভোলেভালা বাবা মানুষটার স্বদেশ নিয়ে এক আবেগের চাপ ।আমি জানি অবসরের পরে কিছুদিনের জন্য হলেও বাবা ফিরে যাবে তার স্বদেশে। আমি তাই এমতাবস্থায় চাপের মুখে পড়ে যাই। মামার বাড়ির ঢেউটিনে টাপুরটুপুর বৃষ্টির ধ্বনি, শহর শিলচরের শৈশবগন্ধ, বাজারিছড়ার না দেখা শনবাঁশের বাড়িতে ঠাকুমার কোলে বসে দোল খাওয়া বাবার নাদুসনুদুস মূর্তিটাও যে ডাকে, আয় চলে আয় মেয়ে। খুব মজা হবে ভেবে আমার সর্বভারতীয় বাঁধন আলগা করি। কৃপালকেও বলে দিই টাটা। বাবাকে বলি কাছাড়ের খাস সিলেটি ছেলে চাই।

এতে আমার কোন অভিসন্ধি নেই। আসলে কম বয়সে বাড়ির বাইরে চলে যাওয়ায় একটু বেশি পেকে যাই। সমলিঙ্গ থেকে বিপরীতের প্রতি আকর্ষণে একটু বেশি মাখামাখি হয় ছেলেদের সঙ্গে। অচিরেই বুঝে যাই, ইংলিশ হিন্দি কিংবা দক্ষিনি ভাষায় প্রেম করায় ভাষাপ্রেমের ব্যাপার থাকে, কিন্তু বড় কষ্ট হয় ব্যবহারে। মানিয়ে নেওয়ায় একটু চাপ হয়। মাতৃভাষায় হৃদয়াবেগ যত তাৎক্ষণিক হয়, অনুবাদের ভাষায় হয় না। ধরা যাক খাওয়া দাওয়ার কথা, সিলেটিদের খাদ্যাভ্যাস একেবারেই আলাদা, পশ্চিমবঙ্গীয়দের সঙ্গে পর্যন্ত মেলে না। আমি সিদল ভর্তা খেতে ভালবাসি, ১০০ রকম ভর্তার রেসিপি আনিয়েছি বাংলাদেশ থেকে। তবে আমার মা রেসিপি বই দেখে রাঁধে না। চালকুমড়ো পাতায় সিদলের পুর দিয়ে একরকম পাতুরি বড়া করে। জিভে জল এসে যায়। সিদল হল পুঁটি মাছের একরকম নরম শুঁটকি। মা সেদ্ধ ডিমের রসা করে আধফালি করে চালের গুঁড়ি দিয়ে ভেজে। কী যে অমৃতপদ হয়। এসব আছে আমাদের। দুপুরের পদে শাক শুক্তো থাকে। থানকুনি পাতা বাটা কিংবা হিঞ্চে বা পলতাপাতার বড়া। ইংরেজি বলা ঝকঝকে সুদর্শন ভিনদেশী পাত্ররা পারবে খেতে কিংবা বলতে, শাকের মধ্যে রুই আর মাছের মধ্যে রুই । রকগানের সঙ্গে আমি নাচতে পারি উদ্দাম, বল্লে বল্লেও

পারি, কিন্তু মাঝেমধ্যে ধামাইল নাচতেও তো মন চায়, চায় সোহাগ চাঁদ বদনির সুরে শরীর দোলাতে। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা বলে কেউ একজন পাশে দাঁড়াবে না শ্রাবন বিকেলে । এসব তো খুব কম চাওয়া, স্বভূমি ছাড়া আমি পাব না কোথায়ও। আমার সন্তান হামটি ডামটি শিখুক হাট্টিমাটিম টা কেন শিখবে না। লালকলম নীলকলমের ঝুলিঝাড়া কথকতা, ঠাকুরমার পায়ের বাড়েএ দোলে দোলে কিচ্ছা শুনবে না সিলেটি মায়ের সন্তান।

আমি কিন্তু দেখতে অসুন্দর নই মোটে। আমি জানি আমার রেটিং। কয়েকজনের মাঝখানে থাকলে এমনকি অনেকজনের মধ্যে থাকলেও পুরুষরা আমাকে দেখে মুগ্ধ হয় পুরুষদেখায় আর মেয়েরা দেখে হিংসেচোখে । শিলচরের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য পাত্র হিসেবে হয়তো দুর্লভ ছিল, এরচে ভাল পাব না। আই আইটির প্রাক্তন, নিজের কোম্পানি দিল্লিতে। শিলচর থাকে দিল্লি যায়। শিকড়ের টানও বলে। প্রভূত ধনসম্পত্তি। ভেবে দেখলাম হবে না। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাঝারি মানের, মার্কশিট দেখানো যাবে না। এসব ছেলেরা ডমিনেটিংও হয়। আজ দিল্লি কাল শিলচর করছে, একদিন বলবে স্টেটসে যাবে, সেটল করবে। তাই ফাৎনা উঠিয়ে নিয়েছি।

পাওয়া গেল সুসিতকে। অনেকটাই মনের মতো। দেখেই মনে হয় খুব কেয়ারিং। গগনচুম্বী উচ্চাশা নেই আবার যথেষ্ট অর্থবানও বটে। মাঝারি পসারের ডেন্টিস্ট। বেড়ানোর শখ আছে, ড্রাইভার থাকলেও নিজে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে। আমি পাশে থাকলে মনটা গুনগুন করে, শিলচর ছাড়িয়ে শিলকুড়ির পথে গিয়ে সুরের বানী মুখে আনে। এই পথ যদি না ইত্যাদি। খাদ্যরুচিতেও বেজায় মিল। থাক পুনরুক্তি দোষেরই হয়। তবে ডিট্টো, সেম টু সেম। শুধু দাঁতের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু জ্ঞান দেওয়ার বাতিক আছে। প্রথম পরিচয়েই বলে ফোকলা দাঁতের মানুষরাই কেন দশলাখ খরচ করে মড্যুলার কিচেন সাজায়। যারাই রান্নাঘর সাজাতে পয়সা খরচ করে তাদের সবারই দাঁতে নাকি ক্যাভিটি নয় গাম সমস্যা। কী দিয়ে খাবে কিচেনের মাল। মাল শব্দটায় একটু রুচিদোষ আছে। তবু আমার শেষ স্বয়ংবর সুসিতকেই নির্বাচন করে। সুসিত বলে বিয়ের পর চাকরি ছাড়তে হবে। আমি বলি না। সে বলে আচ্ছা। মহা ফ্যাসাদ। এত বাধ্য হলে কী চলে, একটু তো ঠুকঠাক করতে হবে। আমি না বলতেই আচ্ছা হয়ে গেল। আমিই কী ঘোড়ার ডিম চাকরি করতে চাই। এক কথায় বললে কী হ্যাঁ করা যায়। আমিতো আর ওর মতো আনকোরা পিস নই। আমার সঙ্গে বিচিত্র সব চার দেওয়া বড়শি

থাকে, খেলিয়ে খেলিয়ে ওঠাই। আসলে সুসিত তখন যে কোন শর্তেই রাজি। এই পাত্রীকেই বিয়ে করবে। শুধু বললএনআরসি লাগবে। আমি পিআরসি জানি এনআরসি জানি না। তাই বলে দিলাম নেই। সে বলল করতে হবে। আমি বললাম, কেন লাগবে, বিবাহসূত্রে স্থায়ী বসবাসকারি হয়ে যায় সবাই। সে বলল আসামে হয় না। আমি তো আমার পিআরসির জ্ঞান নিয়ে চালিয়ে দিয়েছি এতক্ষণ। বুঝতে পারছি এনআরসিটা জটিল। কারণ সুসিতকে এই প্রথম তার বিয়ে নিয়ে চিন্তান্বিত লাগল।

আমি আবার বাবার শরণাপন্ন হই। বাবাও জানে না, জানলেও তার আসাম যোগসূত্র সব জানে। ক্লিক করে। আই লোরেন্দ্র সিং। এবার সংলাপের আকারে বাবা আর কাকুর ফোনবার্তা সাজিয়ে দিই। লোরেন্দ্রকাকুর সংলাপগুলি আভাসে আর যুক্তিতে পুনর্গঠন করেছি। বাবার প্রশ্নছিল এতসব কাণ্ড ঘটে গেছে বাবাকে জানায় নি কেন। কাকু বলে,

--- এখন তো তুই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক তাই দরকার নেই।

--- নেই কেন? আমি যেকোনো সময় ফিরে যেতে পারি। আমার জমি আছে। অবসরের পর বাড়ি করব, খেতখামার করব। আমার মেয়েও আসবে। পাসপোর্ট লাগবে নাকি? আমি এদেশের নাগরিক, ভারতরাষ্ট্রের।

--- এসব চলবে নারে ভাই। আসামের নাগরিকপঞ্জি নবায়ন হচ্ছে এবার ৬৪ বছর পর। আসামে বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে চুক্তি হয়েছিল ভারত সরকার আর আসাম ছাত্র ইউনিয়ন আর আসাম গণসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে।

--- জানি । এনআরসি টা কী বল?

---ন্যাশেনেল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস। ১৯৫১ র পর আর নবায়ন হয় নি। রেজিস্টারে নাম উঠলে একটা মাদুলি দেওয়া হবে, পরে থাকতে হবে আইডি কার্ড।

--- এদিকে তো হচ্চে না, ওটা কী শুধু আসামের জন্য?

--- আসাম এনআরসি। ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১ র ২৪ মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

--- মাঝরাত পেরিয়ে গেলে ?

--- বিদেশি। শনাক্ত করণ হয়ে গেলে বিতাড়ন। বিতাড়নের দুরকম উপায় আছে। এক, ডিপোর্টেশন, দুদেশের মধ্যে কথাবার্তা বলে। দুই, ঘাড়ধাক্কা। সীমান্তে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দেওয়া। পোশাকি নাম পুশব্যাক।

--- আচ্ছা লোরেন্দ্র তুই কে? আমার বন্ধু, না ঐ উগ্রজাতীয়তাবাদি আসাম সরকারের দালাল। ওদের ভাষায় কথা বলছিস?

--- আমি মণিপুরি।

--- শোনরে মণিপুরি গী মচা। ১৯৫১ র নাগরিকপঞ্জি আর ১৯৭১ এক মধ্যরাত্রি দিয়ে আমার কী হবে? তোর আমার তো নামই নেই, ভোটার হইনি তখনও। যাদের নাম আছে বেশির ভাগ তো মরেই গেছে।

--- বাবা মা ঠাকুর্দা কারো নাম তো থাকবে। ওটাই উত্তরাধিকার। লিগ্যাসি। বের করতে হবে কম্পূটার থেকে।

--- আমি কম্পূটার জানি না। গ্রামের চাষা জানে না।

--- তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিতেই ওরা আটঘাট বেঁধে নেমেছে। সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। লিগ্যাসি ডাটার সঙ্গে একটা এগারো সংখ্যার কোড দেওয়া থাকবে।

--- বেশ।

--- এবার লিগ্যাসির সঙ্গে তোকে জুড়ে দে। প্রমাণ কর তুই প্রদোষ বিশ্বাসের ছেলে। তারজন্য তথ্য দিতে হবে । চৌদ্দটি সহায়ক নথির যে কোন একটি তো চাই।

--- যেমন?

--- জমির পাট্টা দাগ ইত্যাদি।

--- মারদিস কেল্লা। আমার আছে। তুই বের করে দিতে পারবি আমার লিগ্যাসি ডাটা? আচ্ছারে লোরেন্দ্র আসাম সরকার তো সবতাতেই ছিল ধীরগতি, বলা হয় ল্যান্ড অফ লাহেলাহে, মানে ধীরে ধীরে। হঠাৎ এই সক্রিয়তা কেন?

--- আমি তো মণিপুরি দালাল। বলব কেন? এই তো গতকালই আসামের এক বিধায়ক, বরাক উপত্যকার, বললেন এনআরসি অবাস্তব। এসব শুধু বাঙালিকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা। ভাতে মারার প্রকল্প। জানে মারারও। ইতিমধ্যে লিগ্যাসি ডাটা না পেয়ে ছসাতজন চাষি পরিবার আত্মহত্যা করে ফেলেছে।

--- আর এত রেকর্ড কী আছে আসামের। ৫১ র নাগরিকপঞ্জি, ৬৬ র ভোটার লিস্ট?

--- আছে কিছু। শুধু বাঙালির নাম গুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আছে ডি ভোটার। সন্দেহজনক, ডি মানে ডাউটফুল। সন্দেহের বসে বন্দী করে রাখা, নির্যাতন। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে পুলিশি নির্যাতন হচ্ছে। যখন যাকে পছন্দ হচ্ছে না তখন তার নামের পাশেই ডি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটাও সন্দেহজনক ভোটারকে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো যায় নি। ডিটেনশন ক্যাম্প নামের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিটলারের জার্মানির ইহুদিদের মতো। ওরা নিজের মাতৃভাষা ভুলে জার্মানিতে কথা বলত, তাও কী বাঁচল? আসামেও বাঙালিরা হয়ে গেল অসমিয়া, চর এলাকায় মানুষ অসমিয়া হয়েও বাঁচতে পারে নি। শুধু বাঙালি নয় রে, অসমিয়া ছাড়া সবাই, এই মণিপুরি দালালও লিগ্যাসি ডাটার পেছনে দৌড়চ্ছে, কিছুই পাই নি এখনও।

আরও অনেক কথা হয় দুই বন্ধুতে মান অভিমানের। তবে একটা কথা বুঝে যাই যে, নেট ঘাঁটলে কিছু পাওয়া যাবে। এবং পাই। বাজারিছড়ায় নেই মেদলিতেও নেই, মায়ের বাড়ি ভুবনগ্রামে নেই। তাহলে অনুসন্ধানের এলাকা একটু বড় করে নিই। কাছাড় জেলার প্রদোষ বিশ্বাসের নাম। পাওয়া যায় ঠাকুর্দার নাম ঠাকুমা ও জেঠুর নাম ও বাবা নেই। এগারো সংখ্যার লিগ্যাসি ডাটা কোড লিখে রাখি ৩১০-৪০৩৮-৮৮২৮। ১১ নং শিলচর চক্র, শিলচর টাউন ওয়ার্ড নং ৭ ইলেক্টরেল খণ্ড ৭। বাবাকে দেখাই, বাবার কী আনন্দ। বলে, সবাই নাকি পরিচিত, শ্রদ্ধেয় জন। প্রণয় কাকুর নাম আছে, প্রণয় কুমার চন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, কম্যুনিস্ট ছিলেন বিসি গুপ্তর বাড়ির সবার নাম, ব্রজমোহন গুপ্ত বাবার মাস্টারমশাই স্কুলের সবচেয়ে ভালমানুষ স্যার। অঞ্জলি সোম সমর আদিত্য বাবার মামা রাধিকা রঞ্জন দাম দিদিমা মানদা সুন্দরী দাম। চায়ের দোকান অমর ভ্রমর দুই ভাই। বাবা ফিরে যায় লুপ্ত সময়ে। দুদিন ধরে ৬৬ এর ১১ নং নির্বাচন কেন্দ্র ঘুরে বেড়ায়। বারবার দেখে পরিচিত নামগুলি। একসময় ফিরে আসে স্বসময়ের বাস্তবতায়। লোরেন্দ্র কাকুকে ডাকে। বলে,

--- শুধু আসাম কেন? নাগরিকপঞ্জি তো হবে ভারতের। রাষ্ট্রের ?

--- হবে হয়তো। এটা আসাম এনআরসি। বিশেষ আইন।

--- তাহলে আর দেশ কী ? কিসের নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫ ?

--- অ্যাকর্ড হয়েছে বলে নবায়ন।

--- বুঝলাম। আমার তো সব আছে। সহায়ক নথিও। লক্ষীপুরের জমি আছে। ফিলাপ করে তোর কাছে পাঠিয়ে দেব। জমা করে দিস।

--- অনলাইনেও হয়ে যাবে।

বাবা আমাকে সব তথ্য দেয়। আমি একে একে সব আপলোড করি মনের আনন্দে। এনআরসি হয়ে গেলে আর বিয়ের বাধা থাকবে না। যতদিন না এনআরসি হচ্ছে আমার আর সুসিতের বিয়ে সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলে থাকে। সুসিত বলেছিল এনআরসি হয়ে যাবে। কী বুঝে বলেছিল কে জানে। তার তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। শেষ পর্যন্ত হাত তুলে দেয়। বলে হবে না। রাষ্ট্রহীন মানুষকে কী করে বিয়ে করবে সে নিয়ে ফাঁফরে পড়ে। আমি কিন্তু নেট ঘেঁটে জেনেছি এরকম বিয়ে হতে পারে, ভিন রাজ্যের নাগরিকের ক্ষেত্রে সদর্থক সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। তবে আমার ক্ষেত্রে বিষয় অন্য। ওকে আশ্বস্ত করে বলি লিগ্যাসি ডাটা পাওয়া গেছে, সহায়ক তথ্য ও আছে। সুসিত আবার খুশি হয়ে বলে এবার এলে করিমগঞ্জের খাই খাই হোটেলে পেটপুরে খাবে দুজনে।

বাবার পাঠানো তথ্য বাতিল হয়ে যায়। ওরকম কোন দাগ পাট্টার সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি লক্ষীপুরে। বাবা রেগে যায়, বললেই হল নাকি। কাকে নালিশ করলে সুরাহা হবে বুঝতে না পেরে লোরেন্দ্র কাকুকেই বলে,

--- এ কী করে হয়? আমাদের জমি, দুজনে মিলে কিনলাম বেড়া দিলাম, নামজারি হল। আমিন ডেকে জরিপ পর্যন্ত করানো হল। এখন বলছে দাগ পাট্টা নেই।

লোরেন্দ্র কাকু চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,

--- নেইরে । নতুন জরিপ হওয়ায় দাগ পাট্টা মুছে গেছে।

--- মুছে গেলেই হল। দাগ পাট্টা মুছে যায়, শেলেটের লেখা নাকি ? তুই মেরে দিয়েছিস শালা। মণিপুরিরা সব পারে ডাকাতের জাত।

বাবার দেওয়া সব অপবাদ কাকু মেনে নেয়। আমি তো শিশুবেলা থেকে দেখছি, কাকু বাবার সঙ্গে তঞ্চকতা করবে না। কাকুর কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়ে বাবা অসহায় হয়ে পড়ে। যা নয় তা বলে বন্ধুকে। হঠাৎ সব হারিয়ে গুম মেরে যায় বাবা। থতমত খেয়ে বসে থাকে উদাস দৃষ্টিতে। জমিটার অর্থমূল্য কিছু নয়, কিন্তু এর সঙ্গে যে আবেগ জড়িয়ে আছে কোটি টাকার। একটা গর্ব, স্থায়ী ঠিকানার মানসিক দলিল, ইচ্ছে করে ভুল তথ্য লেখার শুদ্ধি প্রমাণ। বাবার ফ্ল্যাট বাড়ি একদম পছন্দ নয়, কলকাতা শহরটাকে কোনদিন মেনে নিতে পারেনি নিজের বলে। তাই শেষ জীবনে একটা ছোট বাড়ি করবে ভেবেছিল, ইসপল্টুর চাল দেবে আর বর্ষার রাতে বৃষ্টি পতনের শব্দ শুনবে। মানুষ তো একা থাকতে পারে না, তাই মুখোমুখি বাড়িতে থাকবে ভেবেছিল দুই বন্ধু। বর্ষার টইটুম্বুর জলে নৌকো করে মাছ ধরবে। আর শীতের সময় নদীর চরে লাইশাক সিম ধনে ফুলকপি বাঁধাকপির বিচরা করবে। লোরেন্দ্র কাকুকে বলেছে বাড়ির সীমানা নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়াও করবে। স্বপ্নের সঙ্গে যে বাবার হৃদয় জুড়ে ছিল তার পরিচয় আর স্থায়ী ঠিকানা। আমারও ভাবতে অবাক লাগে লোরেন্দ্রকাকু পর্যন্ত কী করে মেনে নিল দাগ পাট্টা হারিয়ে যাওয়ার গল্প। কিছু একটা তো আছে রহস্য।

বাবাকে লুকিয়ে আমি টেলিফোন করি। কাকু আমার গলা পেয়েই ঝরঝর করে কাঁদে। বলে,

--- তোর বাপটা একটা বোকা, মাথামোটা। আমাকেও তার বোকামির সামিল করে নিয়েছিল। আমাদের জমিটা বড় সুন্দর ছিল রে। দুদিকে দুটো বাঁশ ঝাড় ছিল। তোর বাবা বলত বাঁশের করুল আর চেঙ মাছের পোনা দিয়ে কড়ু হয়। আমরাও খাই, ইরম্বায় দিই। হারিয়ে গেল।

--- জমিটার কী হল কাকু?

--- সে কি আজকের কথা ? অনেক বছর আগেই বরাক নদী নিয়ে নেয় তোর বাবার পরিচয়, স্থায়ী ঠিকানা।

--- বাবাকে জানাও নি কেন?

--- তোর বাবাকে জানিস না? কেমন আবেগপ্রবণ। তুইও থাকিস ব্যাঙ্গালোর। বুড়োবুড়ি দুজন একা একা। আমার উপর এত ভরসা করেছিল। রাখতে পারলাম না। শুনলি না আমাকে কত কথা শুনিয়ে দিল ঠগ জোচ্চার।

--- ওসব তোমাদের কথা, আমি কি জানি।

--- পাগলের কথায় আমিও কান দিই না। শুধু দেখে রাখিস। কোন কাণ্ড না ঘটিয়ে দেয়।

বাবা কাণ্ড একটা ঘটিয়েছে সত্যি। রিটায়ার করে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে । সব টাকা পয়সা নিয়ে রওয়ানা দেয় শিলচর অভিমুখে। আবার শিলচর শহরের উপকণ্ঠে রামনগরে নদীর পারে চারকাঠা জমি কেনে। বাড়ি বানিয়ে বসবাসও শুরু করে দেয়। বাবাকে কেউ এনআরসি র কথা বললে চুপ মেরে থাকে। বাবা আমাকে বলে দেখি কে তাড়ায় তার স্বদেশ থেকে।

সুসিতও বাবার অনুগত হয়ে আসাম এনআরসিতে নামহীন আমাকে বিয়ে করে। সুসিতের অনুরোধে অনেক নকল গাঁইগুই করে ব্যাঙ্গালোরের চাকরিও ছেড়ে দিই ।

এখানে আমার নামটা জরুরি নয়। কিন্তু আমার বাবা স্বদেশ বিশ্বাসের নামটা জরুরি । কারণ গল্পে নায়ক নাম থাকাটা দস্তুর।

■ রণবীর পুরকায়স্থ ■

স্থায়ী ঠিকানা

*****

তামার টাট

শেখরকাকুর গায়ের রং কালো, কালো রঙের গ্রীক ভাস্কর্য। মনে হয় পাথরে খোদাই মূর্তি। শেখর কাকু কথা বলে কম কিন্তু হাসে মিস্টি করে। তিন রকমের হাসি আছে তার, খুব কৃপণের মতো হাসে, মার সামনে বেশি হাসলে যেন তার সব সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাবে, তাও বাবার সঙ্গে হাসিতে ফাউ দেয় অনেকটাই আর তার সঙ্গের হাসি হল আগল ভাঙা ঢেউ যেন বিগবাজার আর নাহাজ এ যা কিছু কেনো আর যা কিছু খাও এর ফ্রি পাশ। শেখর কাকু শিলচরের বিখ্যাত মানুষ। শেখর কাকু গল্প লেখে উপন্যাস লেখে। সিনেমা করে নি, কিন্তু সিনেমা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আছে পড়াশুনা করে। যখন তার লেখালেখির দুরন্ত সময় তখনই নাকি গল্প লিখত চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে। ওকেও খুব উৎসাহ দিয়ে বলত পুণার ফিল্ম ইন্সটিটিউটকে ভর্তি করিয়ে দেবে। বলত সাই পরঞ্জপে মীরা নায়ার অরুন্ধতী দেবীদের কথা। ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মেয়ে কান্তার জীবনে চমৎকার খুব একটা কিছু হয় নি । সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা শিখে এসে পিআরসি এনআরসি ডি ভোটার ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে সিনেমা তৈরি করে নি। সে যে সাহিত্যিক শেখর কাকুর এত ভক্ত তাও তার সাহিত্য কর্ম কিছুই পড়ে নি। শৈশবে না বুঝে কথা দিয়েও তার লেখা ফেরারী গল্প নিয়ে ছবি করার কথাও মনে নেই। শেখরকাকুকে সে দেখে আসছে ছোটবেলা থেকে, ইটখোলায় তাদের পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বাড়িতে। কান্তার তখন সাহিত্য টাহিত্য বুঝার বয়স নয়। কান্তার বাবারও তেমন পড়াশুনা নেই। পঞ্চম সিংএর গ্যারেজে ওয়েল্ডিং এর কাজ করত। শেখর কাকুর হিসেব পত্র দেখার কাজ। বাবার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা, সেই সূত্রে বাড়িতে আসে, মা চা করে দেয়। বাবা আর কাকু বিড়ি খায় খুব। ওরা গল্প করে, কান্তা বসে থাকে। শেখর কাকু বাবাকে বলে,

--- দেখে নিও নির্বাসদা, আমি একদিন হলিউড চলে যাব। তোমাদের ঐ পঞ্চম সিংএর গ্যারেজের কাজ আমার নয় ।

কান্তাকে তার বাবা বলত ডায়নোসরের ফুসফুস নামে এক গল্পের কথা। চিত্রনাট্যের আকারে লেখা, শিলচরের পাঠক পাবলিক ধরতেই পারল না গল্পটা। কান্তা যে পড়ে নি শেখর কাকুর লেখা তা নয়, তবে তার বাবা সব পড়েছে বলে,

---ওরে বাবা কী দারুন লেখক !

বিন্দু বিন্দু জল নামের একটি ছোট উপন্যাসের পরতে পরতে দেশভাগের যন্ত্রণা। কান্তাওসব বুঝে না, দেশভাগ বুঝবে কী করে, ওর বাবারা তো এদেশের মানুষ। কাটলিছড়া ধলাইমলাই গ্রামে ওদের বাড়ি। ওখানে একটি বসতবাড়ি আছে। ব্যাস আর কিছু নেই, অনেক শরিক, ভাগ হলে গ্রামের জমি আধকাঠাও পড়বে না ভাগে। কয়েকজন কাকা, জেঠা থাকে এক রক্তের। কাটলিছড়া শহর থেকে অনেক দূর, প্রায় দুঘণ্টার হাঁটাপথ। ছোটকাকুর বিয়ের সময় কাটলিছড়া থেকে হেঁটে বাড়ি গেছে কাকু কাকি মুকুট মাথায় দিয়ে। একটা শুধু হ্যাজাকবাতি জ্বলেছিল একজন মানুষের হাতে। নদীও একটা হেঁটে পার হতে হয়েছে, জল ছিল না। সেই ছোটবেলাই বয়স কতজানে না, ছোটই খুব। শিলচরে থাকত ওরা, সাপনালার শেষ মাথায় ক্রোজিয়ার কোম্পানির গায়ে ম্যালেরিয়া অফিসের পিয়ন ছিল ঠাকুর্দা, কাকা জেঠা সবাই ছিল দোতলার কোয়ার্টারে, একটা দোকানও ছিল তাদের বিড়ি সিগারেট পান ও মনিহারি জিনিষের । ঠাকুর্দা মরে গেল আর সব ছেলেরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল এদিক ওদিক। কান্তার বাবা হয়ে গেল ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি ।

এসব তো তথ্য শুধু বিগত দিনের। কান্তা লস্কর লেখাপড়ায় মন্দ নয়, বিএ পাশ করেছে কাছাড় কলেজ থেকে ।আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। টেট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে কিন্তু পিআরসি নেই বলে এগোনো যায় নি। আসামে পিআরসি না থাকলে কিছু হয় না,পিআরসিমানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সারটিফিকেট মানে আসামে থাকার স্থায়ী শংসাপত্র। তার নেই, তাদের কারও নেই। কান্তা তার বাবার উপর রাগ দেখায়। বলে,

--- একটা পিআরসি যোগাড় করতে পার না। লিগ্যাসি ডাটা নেই কারো। কোন দেশের নাগরিক তুমি বাবা ?মহাপ্রভু কলোনির মীনাক্ষী কাকিমার বাপের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ বলে এনআরসি হয় না। সুচন্দা নামের ঘরের বৌকে বিনা দোষে ঢুকিয়ে দেয় ডিটেনশন ক্যাম্পে, ডিটেনশন না কনসেন্ট্রেশন? আমরা কী ইহুদি, খৃষ্টানেও মারে মুসলমানেও মারে। আমরা কী রামায়ণের সীতা যে এনআরসির জন্য আগুনের পরীক্ষা দিতে হবে?

শেখর কাকু এলে কান্তার বাবার হুঁস থাকে না, কে কী বলছে শুনতে চায় না। বাবা শেখর কাকুর রাজকীয় বসার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকে। শেখর কাকুর কথা বলা অনেক কমে গেছে, বাবাই শুধু বকবক করে আর কাকু শুধু হাসে। বাবা কিংবা কাকু কেউই এখন পঞ্চম

সিংএর গ্যারেজে কাজ করে না, গ্যারেজ ভেঙে পাঁচতলা বাড়ি হয়েছে। ওদের দুজনেরই অবসর জীবন,দুজনেরই অসুস্থ শরীর। কিন্তু মনের দিকে এখনও সেই কুড়ি বছর আগের দেখা বাবা কাকা। কাকু এখনও হাসে, এখনও বলে সিনেমা করবে ত্রুফো বুনুয়েল অ্যাটেনবরোর মতো। কান্তার বাবা সিনেমা টিনেমা বুঝে না, গল্প লিখতে বলে। বলে,

--- তুমি লেখো শেখরদা। আমি প্লট দেব ।

যেন শেখর কাকু বাবার প্লটের অপেক্ষায় গল্প লিখছে না। কান্তার আবার সব সময় এককথা ভাল লাগে না। তার রাগের কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায় মানুষটাকে চিমটি কাটে। কান্তার বাবা ততক্ষণে মেয়ের অভিমানে লাগাম দেয়। পিআরসি এনআরসির গঞ্জনা সয়ে শেখর কাকুকে সাক্ষীমানে। বলে,

--- শেখরদা সেবাকেন্দ্রে কেউ জানাশুনা আছে তোমার ?

কান্তা বাপকে থামিয়ে দেয়। বলে,

--- সেবাকেন্দ্রে মেশিন কথা বলে। তাও ওদের পিন ৫১ আর ৭১ এ আটকে আছে আধখেঁচড়া। আমার এরকম নাগরিকত্ব চাই না, সারা দেশের সঙ্গে নাগরিকত্ব চাই, ১৯৫৫ র নাগরিকত্ব আইন মোতাবেক।

--- আচ্ছা গো রানী দুর্গাবতী। এখন দুকাপ চা আনতো দেখি। শেখরদা একটু চিনি দেবে নাকি? আচ্ছা দিস না, মিস্টি বিস্কুট একটা খাবে ফিফটি ফিফটি ?

কান্তা কার উপর রাগ করবে। মান অভিমানের কথা বলবে। যত বুড়ো হচ্চে মানুষটা শিশুর মতো হয়ে যাচ্ছে, চিন্তা নেই ভাবনা নেই। খাও দাও আর শেখরকাকু এলে প্লট প্লট খেলো। শেখর কাকু আর তার বাবার একটা যুগলবন্দী আছে। কান্তার বাবা গল্প বলে খুব সাজিয়ে গুছিয়ে, কথা দিয়ে ঘটিয়ে দেয় ঘটনা আর পাত্রপাত্রীর নড়াচড়া। তাই বসে বসে মুগ্ধ হয়ে শোনে। এক মিনিটের মধ্যে দুকাপ লিকার চা বানিয়ে ফিরে আসে। তাও বাবা বসতে দেয় না তাকে। বলে,

--- যা তো মা। তোর ঠাকুর্মার ট্রাঙ্ক থেকে তামার টাটিটা নিয়ে আয়।

বেশি হলে একহাত মাপের গোলাকার এক তামার থালার নাম টাটি। থালার ভিতরে খোদাই করা কয়েকটি নাম, সবার উপরে লেখা দীননাথ লস্কর, তারপর আদিনাথ, শিবনাথ দুইভাই, সবার শেষে শিবনাথের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ লস্কর। একটি গাছের অবয়বের নীচে ঝুলে ঝুলে নামছে যেন ফল, আরো অনেক জায়গা আছে পরবর্তী নাম খোদাই করার। কান্তা বাবার ঈশারায় শেখর কাকুর হাতে দিতেই কাকু বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কথার আগে হাসি ফোটে মুখে। হাসির পর বলে,

--- এই গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে? এই বংশ বৃক্ষের ইতিহাস জানো তুমি ?

--- জানি ।

বাবা প্লটকথা শুরুর আগে মঙ্গলা চরণ করে প্রপিতামহকে স্মরণ করে। বলে,

--- ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি গল্প রামভজ গোস্বামীর। বংশ পরম্পরায় গোস্বামীরা বৈদ্য । বৈদ্য মানে কবিরাজ, হিন্দিতে বৈদজি। রামভজরা আবার ব্রাহ্মণও বটে। ওদের পৈত্রিক বাসভূমি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওরা নিশ্চিত যে কনৌজ কিংবা মিথিলার ব্রাহ্মণ নয়। ওরা ওবধি, ঘাগরা নদীর পারে রামপৈড়ি ঘাটে তাদের তিনতলা বাড়ি কয়েক পুরুষের বাসস্থান। গোষ্ঠী বেরাদির মানুষ অযোদ্ধ্যা নগরে বিশেষ করে ঘাগরা পারে ছড়িয়ে আছে। সবাই একবার না একবার কোন না কোন সময় দেশের বাড়ি ঘুরে আসে। দেশে গিয়ে ওদের আদি বাসস্থানের নতুন নতুন তথ্য নিয়ে ফেরে। ওরা যে বৃন্দাবনের বাসিন্দা ছিলেন সে তথ্যও বেশ জোরালো। উপকথা পুরাণকথা উদ্ধৃত করে কেউ কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হওয়ার পর ওরাও মথুরা চলে যায়। মথুরা থেকে গুজরাট। বৃদ্ধ বুজুর্গরা খুব গর্বের সঙ্গে তাদের রাজার গুণকীর্তন করে। বলে কিষণ মহারাজ রক্তক্ষয় চাইলেন না তাই যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কংসের মতো মহাপাপীকে মেরে যে দুভাই রাজা হয়েছিল তারাই মগধ রাজার ভয়ে চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে। আর একপক্ষ ইতিহাসের কাছাকাছি নিয়ে আসে যুক্তি। বলে ইব্রাহিম লোদীর ভয়ে তখন সবাই ব্রজ ছেড়ে পালিয়েছিল, চুরাশি ক্রোশ হিন্দুশূন্য হয়েছিল। তখন গোস্বামীরাও সরযূর তীরে এসে ভেসে উঠেছিল । এখন তো জেলা ফৈজাবাদ তখন ছিল সাকেত।

কান্তা তার বাবার প্লটগল্পে দীর্ঘ উপক্রমণিকা শুনতে শুনতে খুব বেশি পুরনো না হওয়া রাগটা আবার মুরুব্বি শেখর কাকুকে ঝাড়ে। বলে

,

--- আচ্ছা কাকু। এত যে ঠাঁই নাড়া হল, গোস্বামীরা লিগ্যাসি ডাটা পেয়েছিল? কিংবা ন্যাশনেল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স নাম উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে?

--- আচছাশেখরদা, আমার মেয়েটা এই লিগ্যাসি আর নাগরিক পঞ্জি নবায়ন নিয়ে পাগল হয়েছে কেন বলতো? চোরের কী থাকে বাটপাড়ের ভয়? আমাদের কী ভয়? এখন বললে এখনই চলে যাব যে দিকে দুচোখ যায় বৌমেয়েকে নিয়ে। কিন্তু কোথায় যাব? কে নেবে? খেতে পরতে দেবে তো? ৬৫ বছর আগে, ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ তে আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ম্যালেরিয়া অফিসের পিওন, রেকর্ড বের করে দেখতে পারে। তা না হলে আরো আগে ১২৭০ সালের রেকর্ড ও আছে আমার কাছে এই তামার টাটে। একটু শোন না চুপ করে, শেখরদাকে প্লটটা দিই। তো বুঝলে তো দাদা রামভজর পরিবারের কেউ না কেউ যে একবার ফৈজাবাদ বেড়াতে যায় তা কিন্তু একশ ভাগ শিকড়ের সন্ধানে নয়। সরযূর তীরে ওদের যে বাড়িটা আছে একটা। ওদের মানে গোস্বামী পরিবারের। গোস্বামীরা যারাই দেশ ছেড়ে গেছে কেউই কিন্তু পেশা ছাড়ে নি, বংশনুক্রমে ওরা বৈদ্য। অযোধ্যার বৈদ্যবাটি যেন একটি গুরুগৃহ, বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো এর গ্রন্থাগার, হাতে লেখা পুঁথি, শতায়ু সব পূর্বপুরুষরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন ভিষক শাস্ত্র। যেহেতু বৃন্দাবনের সঙ্গে তাদের আদি পুরুষের সংযোগ আছে তাই শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলার গোকুল নন্দগ্রাম রাধারানীজির বর্ষণা গোবর্ধন পর্বত সহ চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমা এবং জড়িবুটি আহরণও তাদের এক বাৎসরিক কার্যক্রম। বৃন্দাবনের ঘনজঙ্গলে চোর ডাকাতের উৎপাত থাকায় শ দেড়শ লোকের টুকরি নিয়ে বেরোয় ব্রজ পরিক্রমা। পরিক্রমার মাঝপথেই শুরু হয় কলেরা। আর তখনই রামভজর পূর্বপুরুষ বৈদ্যরাজ রামনরেশ গোস্বামী আর তার স্ত্রীর অক্লান্ত সেবাও চিকিৎসায় সুস্থ করে তুলে পূণ্যার্থী দের। একজনেরও মৃত্যু হয় না। ধন্য ধন্য পড়ে যায় যুবক বৈদ্যজি আর বৈদ্যানির। এর মধ্যে দীননাথ লস্কর নামের এক ধনাঢ্য ব্যাক্তি তার স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্র আদিনাথ শিবনাথ এসে রাসনরেশ বৈদ্য আর স্ত্রীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ওদের মুখে বিচিত্র ভাষা। কাছাড়ের মানুষ তো, কাছাড়ের ভাষায় কথা বলে। রামনরেশ পা সরিয়ে নেয়। দীননাথ লস্কর বলে, --আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি ভগবানের সঙ্গে লড়াই করেন। বৈদ্যরাজও বলে,--ব্রাহ্মণ হলে কী হয়েছে, আমিও মানুষ আপনার মতো। আপনি পিতৃতুল্য। দীননাথ বলে, --আপনি সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কী করে রক্ষা করলেন এতো ভক্তজনকে! কবিরাজ বলে, --

বৈদ্যর কাজই সেবা। আপনাদের ভাষা বড় বিচিত্র। লস্কর জমিদার বলে,--আমরা বাঙালি, কাছাড়ে থাকি। --কাছাড় কোথায়? --আসাম। --আসাম কোথায়? --তন্ত্রপীঠ কামাখ্যার নাম শুনেছেন। দেবীর যোনীপীঠ। সিলেট দেশে আছে আরো দুটি বাহান্নপীঠের। আমরা থাকি হেড়ম্ব দেশে। জেলা কাছাড়, শহর শিলচর। --জানি, আসামে যাইনি কোনোদিন। যাব একবার কামাখ্যা দর্শনে। --চলুন এবার আমাদের সঙ্গে । বৈদ্য বৈদ্যানি দুজনেই রাজি।

দীননাথ লস্কর কিন্তু হেলা ফেলার মানুষ নয়। শিলচরের বিরাট ভূস্বামী। এদিকে দীননাথ লস্করও রামনরেশের দুর্বলতা জেনে গেছে, পায়ে হাত দিলেই কাবু হয়ে যায় সদাহাস্যময় পুরুষ। দীননাথ জমিদার তাকে নিয়ে যায় শিলচরে। শহরের বিশালতম বাড়ি ইটখোলা পাড়ায়, বিরাট সিংদরজা। রামনরেশ বৈদ্যর ভাল লাগে বাড়ি। দীননাথ লস্কর বলে, --গুরুজি এখন থেকে এই বাড়ি আপনার। আমাকে শুধু এককোণে থাকতে দেবেন। রামনরেশ রাজি নয়। বলে, --একি কথা, আমি অযোধ্যায় ফিরে যাব। --আপনাকে যেতে দিলে তো। আপনি এখানে আপনার সেবা কর্ম করবেন, এখানেই আপনার আরোগ্য আশ্রম হবে গুরুদেব। আপনি আমাকে জীবন দিয়েছেন, আমার সর্বস্ব আপনাকে দেব।

শিলচর জনপদের বাইরে মেহেরপুর নামের এক গ্রাম, গ্রামের পূর্ব দিকে লস্কর টিলা, দীননাথ লস্করের জমিদারি। জমিদার নবীন বৈদ্য রামনরেশ কে বলে, --আপনি চারদিকে তাকিয়ে যা দেখছেন প্রভু সব আপনার। আপনার নামে জমাবন্দি করে দেব সারা জীবন স্বত্ব ভোগ করবেন। গোস্বামী চিকিৎসক বলে, --এখানে তো দেখি চাষ আবাদও হয় না তেমন, একটা গোশালা করে নাও না কেন? --তাই হবে গুরু। মেহেরপুরে পঞ্চাশটি গরু দিয়ে গোশালা হয়, গোশালার জমি আর ইটখোলার ভদ্রাসন সব লিখে দেয় অযোধ্যার বৈদ্যরাজকে। স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলে, --শূন্য ছিল শূন্য দিয়ে দিলাম এবার দেখ শূন্যের কেরামতি। কেরামতি কিছু হয় নি লস্কর মহামতির। কিন্তু রামনরেশ গোস্বামীর বংশ হিন্দিভাষী থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। রামনরেশের তৃতীয় প্রজন্মের বংশধর, মানে তার নাতি রামভজ পর্যন্ত বংশের ধারা রক্ষিত হয়। রামভজ কবিরাজ হলেও লাল পালোয়ানের শিষ্য। মস্তোবর কুস্তিগীর। নরসিংটোলার গোস্বামী দাওয়াখানায় কিছুদিন কবিরাজি করে মন ভরে না। ভজ বৈদ্যর তখন কিছু বাঙালি বন্ধুবান্ধব হয় যারা চা বাগানের নেতাগিরি করে। তাকে শোনায় চা শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার কথা। সে যায় চা বাগানে কাছাড়ে সিলেটে, বৈদ্য হয়ে ঢুকে নেতা হয়ে

ফেরে। তখন দক্ষিণ সিলেটের চা বাগান গুলিতে শুরু হয়েছে আন্দোলন । মুলুক যাওয়ার লড়াই।

আবার কান্তা তার বাবাকে থামিয়ে দেয়। বলে,

--- বাবা, তোমার প্লট কিন্তু গল্পের নিয়ম মানছে না।

--- না মানুক, শেখরদার কলমে ঢুকলে সব সাইজ হয়ে যাবে।

--- গল্পে প্রোটাগনিস্ট থাকে,এন্টাগনিস্ট থাকে বলেছে কাকু। নায়ক আর ভিলেইন। তোমার কথায় নায়ককে এত কম জায়গা দিয়েছ আর যে লোকটা নায়কের সব ঝেড়ে দিল তার জন্য বাকি গল্প। হল না বাবা, তামার টাটকে তুমি ইচ্ছে করে আটকে দিলে। যদি আটকেই দেবে তবে বংশগাছে দীননাথ লস্করের পর আরো তিনটে নাম কেন দিলে অকারণ। এক লস্করেই শেষ করে দিতে পারত।

কান্তা এরকমই। বাবার এই গোস্বামী নিয়ে আদিখ্যেতা পছন্দ নয় বলে থামিয়ে দেয় গল্পবলা। কান্তার রাগ কিন্তু ক্ষণিকের, মনে কোন দুঃখ নেই। বলার পর সব ভুলেও যায় সঙ্গে সঙ্গে।

কান্তা একটি সাইবার কাফে চালায় ,সঙ্গে জেরক্স মেশিন । তার নিজের নয় কুঞ্জ সিং মালিক। সারাদিনের কাজ নয়। বাঁধাধরাও নয় যে সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা, সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতেই হবে। বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় বইখাতা জেরক্স থাকলে বাড়তি রাতেথেকে করে দেয়। কুঞ্জকাকু দেয় মন্দনা। কোন কাজ পড়লে দোকান একদিন দুদিন বন্ধ থাকলেও কিছু না। বলে,

--- আমি কম্যুনিস্ট পরিবারের ছেলে। শ্রমিক দরদি।

ঘোড়ার ডিম দরদ। বসে বসে মুনাফা খায়। তবে দোকানটা মোক্ষম জায়গায়, নন্দসিং কমপ্লেক্স কলেজের গায়ে হওয়ায় প্রথম প্রথম জোড়ায় জোড়ায় ঢুকে যেত ঘেরা দেওয়া ঘরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কান্তা বলতেই ঘেরা তুলে দেয় কুঞ্জকাকু, সাইবার কাফেতে ভিড় কমে যায়, জেরক্স কাগজ কলম খাতা বিক্রিতে পুষিয়ে দেয় কান্তা। ইদানীং তো জেরক্স এর রমরমা। এনআরসি র সাপোর্টিং ডাটা, আর লিগ্যাসি ডাটা প্রিন্টিং এ পাতা প্রতি দশটাকা। যাদের

লিগ্যাসি ডাটা আছে এগারো সংখ্যার তাদের কী আনন্দ। আর যাদের আধাখেঁচড়া এটা আছে ওটা নেই, ওদের রাগ ক্ষোভ বিশ্ব সংসারের উপর, আর সব কিছুর যোগাযোগমাধ্যম হচ্চে কান্তা। নীরব হাসিতে সে সবাইকে সমর্থন করে যায়। হাসি না বিদ্রূপ বুঝা যায় না। ওর হাসি নিয়ে কেউ একজন ক্লিওপেট্রার হাসি বলে মন্তব্য করেছিল।

কান্তা দেখতে মন্দ নয়। সুন্দরের কথা নয়, ব্যক্তিত্বময়ী মেয়েটি আবার সদাহাস্যময়ী। বাবার উপর যে কপট রাগ দেখায় ওটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে়না। সেই মেয়েটিও একদিন রাগল, রাগ থেকে কী কী হল সে তো পরের কথা। ঘটনা একটা ঘটেছিল, খদ্দের লক্ষী হয়ে ঢুকেছিল দুপুর বারোটা নাগাদ, কান্তা ড্রয়ারের ভিতর টিফিন কৌটোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। একগাদা এনআরসি দলিল জেরক্স হবে এবং লিগ্যাসি ডাটা ছাপা হবে, এনআরসির সার্কুলারও এককপি । সবকিছু ছেপে বের করে দিতে হবে তক্ষুনি, ভেরি আর্জেন্ট। ছেলেটিকে চেনে কান্তা, বানীপাড়ার ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা। কোথাকার কোন জমিদারের ছেলে। মানে বড়লোক, বড়লোক দেখলেই কান্তা একটু ইচ্ছে করেই ঝগড়া করে। আসলে সে খাচ্ছিল না, টিফিন কৌটোয় হাত রেখেছিল। বলল,

--- দেরি হব, খেয়ে নিই।

আর খেলেই বা কী। দু মিনিটেই শেষ হয়ে যায়। শুকনো রুটি দুটো আর পচা ডালের ঝুরা। মা ফেলে না কিছুই, গেঁজিয়ে ওঠা ডালকেই কেমন উপাদেয় ঝুরা বানিয়ে দেয়। একদিন কলেজের এক বান্ধবীকে বলেছিল, মেয়েটি অম্বিকাপট্টিতে থাকে, মানে তার থেকে বড়লোক। তার মতো বিত্তহীন থেকে দু এক ধাপ উপরে। বলেছিল ইলিশ মাছের ঝুরার কথা। বললে,-- কী অসাধারণ স্বাদরে! মেয়েটি এবং অন্যরা চুপ থেকে হেসেছে। তখন খেয়াল করেনি, পরে বুঝেছে হাসির মর্মার্থ। ইলিশ মাছ কেউ ঝুরা করে খায় না, পচে না গেলে কেন আর পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভাজা করে খাবে। তাই সে এখন তার স্তর বুঝে কথা বলে। ছেলেটি তার কথা বিশ্বাস করে না। বলে,

--- আপনি খাচ্ছেন না।

--- কী করে বুঝলেন? খেয়ে দেখবেন?

ছেলেটি এবার ফিক করে হেসে ফেলে। বলে,

--- খাওয়াবেন? এত কাজের চাপ যাচ্ছে সকাল থেকে কিছুই খাই নি ।

কান্তা খাইয়ে দেয়, একটা রুটির ভিতর ঢুকিয়ে পচা ডালের ঝুরো। খেয়ে তো উৎফুল্ল ছেলেটি। বলল,

--- আমার নাম অনিকেত গোস্বামী, গ্লাসডোরে আমার একটা বিজ্ঞাপন লাগিয়ে দেবেন?

কান্তার চোখে চশমা নেই কিন্তু চশমার ফাঁক দিয়ে দেখার মতো দেখে ছেলেটিকে। তার থেকে যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু কী বলতে চাইছে। ছেলেটিও বুঝতে পারে কথা শেষ না করায় একটু বিভ্রান্তি হয়ে গেছে। বলে,

--- না না তেমন কিছু না। বিনি পয়সায় টিউশানি করব, তার বিজ্ঞাপন।

কান্তা হাসমুখ থাকলেও একটু মুখকাটা তো আছে। বলে,

--- কেন ? রাজনীতি করবেন নাকি ?

ছেলেটি চুপ করে থাকে। বোকার মতো হাস। বলে,

--- এম এ পাশ করেছি পলসাইন্সে। অরুণ চন্দ্রয় ভর্তি হয়েছি। ল পড়ব।

--- স্বনামধন্য উকিল হবে ? নাকি প্রফেসার ?

--- কোনটাই না । তুমি যা বলেছ তাই। রাজনীতি করব ।

--- সে তো অনেক পরে। লেগে থাকতে হবে। তোমার বাইক আছে?

--- আছে। গাড়িও আছে।

--- উরি বাবা।

--- না না, গাড়ি চড়া এখন কিছুদিন বন্ধ রাখব ।

--- কেন? দাদার চামচাগিরি করবে? বাইক বাহিনি? রাজনীতির প্রথম কথাই কিন্তু সমাজ বিরোধী হওয়া। ছুরি চাক্কু বন্দুক চালানো, নেতা মন্ত্রী দাদাদের প্রটেকশন দেওয়া।

--- আমি অন্যরকম। রেডি হয়ে নামব। ফিল্ডওয়ার্ক করছি। এই যে বললাম ফ্রিতে ট্যুইশানি করব, পাবলিসিটি হবে। পিআরসি এনআরসি ব্রডগেজ মহাসড়ক বরাকের কান্না অবহেলিত বরাক নিয়ে কাজ করব। লইয়ার হয়ে লিগ্যাল এইড দেব।

--- তুমি কী খুব বড়লোক?

--- তা আছি, মাটিতে এখনও অনেক টাকা ।

--- কোথায় ?

--- মেহেরপুরে। শিবালিক পার্ক পেরিয়ে বাঁদিকে টিলাজমির এখন খুব দাম। ডাক্তার উকিল সরকারি কর্মচারিরা কিঞ্ছে। যাদের প্রচুর টাকা ঘুষের ,আর জানিগঞ্জের ব্যবসায়ী রাও কিনছে। যা দাম হাঁকাচ্ছি কিনে নিচ্ছে।

--- তুমি কী খুব কৃপণ? এত যখন টাকা, বাড়িতেই তো জেরক্স লাগিয়ে নিতে পার। কম্পূটার নেই, প্রিন্টার?

--- ল্যাপটপ আছে। তবে দোকানে এসে জেরক্স করার অন্য ভ্যালু। তোমার সঙ্গে কথা হল, জনসংযোগ হল।

অনিকেত গোস্বামীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেশ পাকা, সে আসে প্রতিদিন কান্তার সঙ্গে কথা বলতে। কান্তাকে তার খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয়। কান্তারও মন্দ লাগে না, সেও হাসিতে এক টুকরো মজা জুড়ে দেয়, বোকা মানুষটি বুঝতেই পারে নি সে কখন ওকে তুমিতে নিয়ে এসেছে। বড়লোকের ছেলে হওয়ার রাগ উবে যায়, আবার রাজনীতির ভূত নিয়ে ওর সঙ্গে শলা পরামর্শ করায় খুশিও হয় । বাবাকে দেওয়ার মতো একটা প্লট তো জমা পড়ল তার ভাণ্ডারে। ও দোকানে এলেই কান্তার খুব খুনসুটি করার ইচ্ছে হয়। বলে,

--- তোমার নামটায় একটু ভুল আছে।

--- আছে তো।

--- অনিকেত মানে যার বাড়ি নেই। গুস্বামী অর্থ জানো ? গরুর মালিক। তুমি তো ভূস্বামী।

--- গরুও আছে। জমি বিক্রি হচ্চে গরুও কমছে। স্থান অসংকুলান হচ্ছে।

--- এত শক্ত বাংলা?

--- কিছু বাংলা কিছু সংস্কৃত। আমরা উত্তর প্রদেশের মানুষ না?

--- আবার স্টোরি? হেভি প্লট হবে।

--- আরে বাবা, কোন প্লট টট না। আমরা এখন বাঙালি। আমার বাবা উনিশে মের সত্যাগ্রহী ছিল। ফুল বাঙালি। তবে সবারই একটা পাস্ট থাকে না? উত্তরাধিকার। সবাই পাস্ট তৈরি করে। গাছ ছাড়া ফল তৈরি হয় কী করে? আমাদেরও একটা গাছ আছে, বলব একদিন। এখন বলো, পিআরসি আছে? এনআরসি? ভোট দাও?

--- আরে ধুর। কিছু নেই। ওসব দিয়ে কী করব? বাবা বলেছে চোরের নেই বাটপাড়ের ভয়।

--- চাকরি পাবে না। জমি কিনতে পারবে না। ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

--- চাকরি তো করছি কুঞ্জকাকুর। আর ছেলে মেয়ে হওয়ার জন্য বিয়ের দরকার। এখনও কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

--- এত নিগেটিভ কেন? সত্যি নেই লিগ্যাসি ডাটা? সাপোর্টিং? বলো তো করিয়ে দিই। আছে লাইন।

--- লাইনে গিয়ে দরকার নেই।

--- ওরকম লাইন নয়। চৌদ্দটা ওপশন তো আছে, একটা না একটা লেগে যাবে। চলো তোমাকে জেরা করি। জেরা করলে বেরিয়ে যাবে।

--- আমার কিছু বেরোবে না। আমার বাবা ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি। ঠাকুর্দা ম্যালেরিয়া অফিসের পিওন ছিল।

--- তাতে কী হয়েছে। আমার এক কাকাও ড্রাইভার ছিল সরকারি বাসের। আমরা তো ফোকটে জমিদার হয়ে গেলাম। ঠাকুর্দা শিলচর বাড়ির দখলদারি ছেড়ে দেওয়ায় মেহেরপুরের অনুর্বর টিলা জমি পেয়ে যায়। কেউ কখনও ভাবে নি মেহেরপুরের জমির দাম এরকম আকাশছোঁয়া হবে। এখনও আছে অনেক, চলো একদিন দেখে আসবে কর্মকাণ্ড ।

অনিকেত কান্তা বাইকে করে এদিক ওদিক যায়। যায় অন্নপূর্ণাঘাট। অনিকেত শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে বলে,

--- দেখবে একদিন শিলচর শহরও মহানগর হয়ে যাবে। বিশাল বিস্তৃত এক জনপদ। মধুরামুখে সেতু হবে দুধপাতিলে। হাতিছড়া উধারবন্দ ঢুকে যাবে শহরে। এদিকে শহিদ স্টেশন থেকে কাটাখাল পর্যন্ত লোকেলট্রেন হবে, ওপারে কাটিগড়া, ধোয়ারবন্দ আর একদিকে। মেহেরপুরের শিবালিক পার্ক থেকে আতালবস্তি হয়ে যাবে ধর্মতলা, কনটসার্কাস। বাংলাদেশ টেশও থাকবে না, বর্ডার না থাকলে আর কেন এনআরসি পিআরসি লিগ্যাসি ডাটা।

--- বুঝলাম সেই বর্ডারহীন দেশ চালাবে কোন হিটলার? অনিকেত জমিদার?

--- আমি কোন জমিদার টার নই? আমরা কবিরাজ, রাজবৈদ্য।

--- ইন্টারেস্টিং তো, তাহলে আমিই একমাত্র জমিদারনি। আমাদের বাড়িতে একটা তামার টাট আছে জানো। ঠাকুমার ভাঙা ট্রাঙ্কে। বারবার বিক্রি হতে গিয়েও নাকি থেকে গেছে। এক টাকায় বিক্রি হয়ে যেত। জানিগঞ্জের শ্রীনিবাস কংসবনিক ঠাকুমাকে আঠআনা এমনি এমনি দিয়ে দেয়। বলে রেখে দেবেন বাড়িতে, কাজে লাগবে। এক কাঠি চালের দাম তখন একটাকা।

--- সত্যি গল্প নাকি? কী আছে এমন আশ্চর্য ঐ টাটিতে?

--- কিছুই না। ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির বাড়িতে কোন গল্প থাকে না।

--- আবার নিগেটিভ। অভিমান। বল না কী আছে তামার টাটে?

--- বাবু দীননাথ লস্করের নাম আছে গাছের উপর, নীচের ডালে আরো তিনটে নাম বাকি সব খালি। শিলচরে শুনেছি বাবু দীননাথের প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল। সব বিলিয়ে দিয়েছে দানবীর। সিলেট কাছাড়ের ইতিহাসেও আছে এই গল্প। কে জানে বিলিয়ে দিয়েছে না বিনস্ট করেছে, আয়েস করে খেয়েছে, বাইজি নাচিয়েছে। এতে আমাদের বিড়ম্বনা তো কমে নি একরতি। মা আর আমি জানি এসব মিথ্যে, গল্প কথা। টাটের নামগুলি যদি মিথ্যে না হয়ে সত্যি হয় তবে এসব লস্করকাহিনি বহন করে কী লাভ। হাস্যকর পরিস্থিতি হয় জানো বাবা যখন গর্ব ভরে বলে সে জমিদারের উত্তরপুরুষ। আমার মাথা লজ্জায় নুয়ে যায়।

--- লজ্জার কী আছে ? সবারই একটা পাস্ট থাকে। উত্তরাধিকার। সবাই অতীত তৈরি করে। আমাদেরও একটা গাছ আছে, নিয়ে যাব একদিন। কিন্তু তোমরা তো কাটলিছড়ার ধলাইমলাই এর বাসিন্দা?

--- সেই তো, তোমারও সংশয়। তবে এরও জবাব আছে একটা অর্দ্ধযুক্তির । কোনো মুসলমান রায়ত নিঃস্ব জমিদারকে দয়া করে নিয়ে যায় শিলচর থেকে দূরে।

--- বেশ তো । জমির দলিল আছে ? ভোটার লিস্ট কাটলিছড়ায় ? ১৯৫১ র ?

--- একান্ন কোথায় পাব ? ৮৯ এ জন্ম।

--- ৭১ এর ভোটার লিস্ট?

--- ধুর।

--- আরে এনআরসির সার্কুলার তো তাই বলে। ৭১ এর ২৪ শে মার্চ এর মধ্যরাত পর্যন্ত নাম থাকলেই হবে। তোমার কেন হবে, তোমার ঠার্কুদা বাবা যে কোনো কারো থাকলেই হবে। আচ্ছা চাকরি করবে একটা? টেম্পরারি, মাইনে খারাপ নয়। কলসেন্টারের কাজ।

--- না না। কুঞ্জকাকু ভালই দেয়, স্থায়ী চাকরি।

--- এনআরসির কলসেন্টারে কাজ করতে করতে একটা উপায় বেরিয়ে আসত।

--- তুমি এতো ভাবছ কেন বলতো? আমার নাগরিকত্ব নেই তার জন্য অতিরিক্ত কোন কাঠখড় পোড়াতে পারব না। আর তোমার প্রবলেমটা কোথায়, তোমাকে তো আমি বিয়েও করব না যে স্ত্রীর আলাদা নাগরিকত্ব চাই।

--- বিয়ে করবে না?

--- না, তা বলিনি। তোমাকে করব না বলেছি।

--- অপরাধ? আমি ব্রাহ্মণ তুমি কায়স্থ, নাকি আমি ধনী তুমি গরিব বলে?

--- গুড। তোমার পর্যবেক্ষণ ভাল। মানুষ খারাপ নয়, স্ট্রেট স্বার্থপর। তোমার রাজনীতিটাও আমি বুঝি। লংটার্ম ইনভেস্টম্যান্ট, রিটার্ন পাবে ভাল। মন্ত্রী টন্ত্রী হয়ে যাবে। তবে এসব প্রেম বিয়ে ভালবাসা তোমাকে মানায় না।

--- স্বার্থপর কাকে বলে জানি না। হয়তো আছি। তবে ডিসঅনেস্ট নই। আমাদের একটা বংশ পরম্পরা আছে। রাজনীতি আমাদের রক্তে। মিথ্যে বলিনি, আমার বাবা উনিশে মের ভাষা আন্দোলনের সত্যাগ্রহী ছিলেন। আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন চা বাগানের শ্রমিক নেতা। তখন দলে দলে শ্রমিক চলে যাচ্ছে বাগান ছেড়ে। চরগোলার নাম শুনেছ? ওদেরই উত্তরপুরুষ আমি, এসব পরিকল্পিত বিভাজনের বিরুদ্ধতা করছি উত্তরাধিকারের ধারায়ই, মানুষে নাগরিকত্ব হরণ করা তো এক নৃশংশ খেলা।

--- পারবে এসব রুখতে? সম্ভব ?

--- আমি বলছি সম্ভব। পিআরসি এনআরসির ক্ষতিকর ভিত্তিবর্ষ রোখা সম্ভব। ব্রডগেজ সম্ভব মহাসড়ক সম্ভব হলে আমাদের বিয়েও সম্ভব।

এক একদিন এক একদিক। এবার বাইক ছুটল মেহেরপুর। শিবালিক পার্ক পেরিয়ে গেল, এসব তো খুব চেনা জায়গা কান্তার। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় রোজ দেখেছে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে যে বাঁয়ে ঘুরে গেল, গলিপথ। চেনে না, অনেক ভিতরে যাওয়ার পর কর্মকাণ্ড নজরে এলো। কী বিশাল বিশাল বাড়ি। নাকি রাজপ্রাসাদ। অনিকেত বলে বলে যাচ্ছে, ডাক্তার কুসুমদাম, ডাক্তার শিবতপন সূত্রধর, অনন্ত সাহা,বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকাদার একজন।মন্ত্রির বাড়ি এখন শুরু হয়নি। সবাইকে শিলচর শহর চেনে একডাকে। আরো ভিতরে, মানে আরো উপরের দিকে। টিলার উপর একটি ছোট মন্দির, মন্দির ঘেরা খাটাল। বেশ কয়েকটি গরু, শন বাঁশেরঅস্থায়ী ঘর কয়েকটি। মন্দিরের ভিতর দুভাগ, একভাগে রামলালা আর সীতা আর এক ভাগে রাধাকৃষ্ণ। প্রতিদিন পূজা হয় হয়তো, অন্তত একটা প্রদীপ আর দু একপিস ফুল তো তাই বলে। মন্দিরের গায়ে নোনাধরা ফলক দেখায় অনিকেত। ফলকের লেখা থেকে দীননাথ লস্করের নামপড়া যায়, সন তারিখও ১২ ই ভাদ্র ১২৭৫। কান্তা অনিকেতকে বলে,

--- কিন্তু মন্দির বিষয়ে কিছু লেখা নেই দেখছি?

--- না নেই, তবে তোমার লিগ্যাসি ডাটা সাপোর্ট করবে টাটের সঙ্গে ।

অনিকেত কান্তা ইতিমধ্যে তাদের পাস্ট মানে অতীতের নির্মাণ কাহিনি নিয়ে কথাবার্তা বলেছে । হাসি তামাসাও করেছে কান্তা । অনিকেত কিন্তু উত্তেজিত হয়েছে । আর ঐ উত্তেজনা থেকেই তার উপরোক্ত সংলাপ। নিরুত্তাপ কান্তা বলে,

--- এনআরসি ডাটা জরুরি। তবে কোন অপমানজনক শর্তে আমি খাতায় নাম লেখাতে চাই না। ভারত রিপাবলিকের নাগরিক আমি, নাগরিকত্ব আইন মোতাবেক আমার নাম উঠবে খাতায়। আমার ঠাকুরদাদার এই পুকুরে জল খাওয়ার রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না বলে জলের উপর আমার অধিকার থাকবে না, এ কেমণ কথা? এসব ভোটের রাজনীতি, সংখ্যাগুরু রাজনীতির বর্জ্য পদার্থ, রাজনীতির সন্ত্রাস।

--- আমিও তো তাই বলছি। রাজনিতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

--- আমি শুধু রাজনীতি বলিনি জমিদার মহাশয়। রাজনীতির সন্ত্রাস বলেছি। তাহলে কী সন্ত্রাস দিয়ে মোকাবিলা করবে? তোমাদের রাজনৈতিক দলবল কিছুই করতে পারবে না জানি। এর জন্যই চাই জাগরণ, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগেই মানুষ জাগবে। একষট্টির উনিশে মেতে জেগেছিল এই এনআর সির প্রহসন নিয়েও জাগবে। তামার টাট আর পাথরের ফলক জোড়া দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমান করতে হবে না।

মুখের আর মনের হাসি যখন একমাত্রায় পৌঁছেযায় তখন বড় অসহায় লাগে কান্তার। দুদুটো কারণে দুজনের প্রতিতার অবিচারের দ্বিধা সঙ্গে নিয়ে হাসিকে জটিল থেকে জটিলতর করে সে। ভাবে, অনিকেত যে তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন এর জন্য তার ভিতরও এক ভাললাগার তোলপাড় চলছে কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছে না। আর শেখর কাকুকে বলা বাবার গল্প কথা সে সম্পূর্ণ করতে দেয়নি বলেও তার গর্ব। টাটের গল্প থামিয়ে সে তো তার বাবার উত্তরাধিকার বহন করেছে কাঁধ বদলে। বাবার প্লট সম্পূর্ণ করার দায় এখন তার একার।

****

ওদের কথা

বৌঠান ডাকটার ওপর আমার একটা অধিকারবোধ কাজ করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ওপর।

ভাবি, আহারে! আমিও যদি জন্ম নিতাম রবিবাবুর কালে?

কী রোমান্টিক জমিদার! কোপাই খোয়াই ভুবনডাঙা একদিকে, শিলাইদহর পদ্মা অন্যদিকে! সাজগোঁজের বোটবাজার!

বৈভবের ব্যবহারে সমকক্ষ না হতে পারার দুঃখ আছে। থাক।

কিন্তু ডাক খোঁজের উত্তরাধিকার তো আমরাই।

তিনি তার প্রিয় মানুষীকে ডাকতেন বৌঠান। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বলেই সুহাসের বৌ মিত্রার জন্য বেছে রাখি বৌঠান ডাকটাই।

এখন তো দুঃখ হয়ই বন্ধু পাড়ার মেয়েকে কেন আলাদা করে দেখেনি?

কেন নজর দিই নি ঢাকাইপট্টির গানবাড়ির মেয়েকে?

ওদের বাড়ির সবাই গান করত। প্যান্ড্যালে আর ডি আই হলে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে গান মানে তো উদ্বোধনী আর সমাপ্তি সঙ্গীত। এর মধ্যে জলসা। মানে হরেকরকম।

সুহাসের সঙ্গেও গান করেছে।

এখন করে না।

ঘরেও গুনগুন করতে শুনিনি বৌঠানকে।

বৌঠানকে বলেছি---

গল্প সিনেমার আভিমান নাকি?

বৌঠান হেসেছে রহস্যের।

শহর শিলচরে, গানের জগতে সুহাস নিজেকে ছাড়া কিছু জানত না।

সুহাস একজনই শিলচরে।

সুহাস আমার বন্ধু।

বন্ধু বলেই হয়তো ওকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছি সবসময়।

শিলচরে গানের কদর ছিল খুব।

মানে, জলসার গান।

আর, সুহাস ছাড়া, আর একটা আর একটা, বলে অ্যাংকর তোলার গান তো কেউ গাইত না।

তখন যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসতেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী আসতেন, সনৎ সিংহ সুবীর সেন আসতেন গোলদিঘিতে।

শস্ত্রীয় সঙ্গীতের শীতও আসত জাঁকিয়ে মধ্যশহরে।

শহরে নাচ চিল, নাটক ছিল।

মুকুন্দ ভট্টাচার্য তাঁর রাণার নাচে বিখ্যাত শম্ভু ভট্টাচার্যর সমকক্ষ। ভরদ্বাজ ভগিনীর নাচ গানও শহর জলসার প্রধান আকর্ষণ।

নাটকের কথায় কাকে ছেড়ে কাকে রাখি?

আর্যপট্টিতে পান্না নাগ নীলু ফেরারী ফৌজ দাপাচ্ছেন, তো ওদিকে অম্বিকাপট্টির পলু বিশ্বাস। মন্টু শেখর বাচ্চুরা তো নাটকে আমার সহাধ্যায়ী। সুমেধা মধুরা আর কাঞ্চনদিও সুন্দরী অভিনেত্রী তখন।

দেখতে সুন্দর মানুষেরা একটু স্বার্থপর হয়।

তার উপর মানুষ পছন্দসই কোনও গুণের অধিকারী হলে তো কথাই নেই। আমিও তো কিছুটা সুহাসের দলে।

আমার অহংকার ছিল মঞ্চের উপর। কবিতার খাতায়।

সুহাস গানের আসর এবং তার বাইরেও দাপিয়ে বেড়াত।

কলকাতা গিয়ে রনো গুহঠাকুরতার কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছে যে! রবীন্দ্র নজরুল ছাড়াও, তালাত মামুদের গান গাইত। ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস’ গাইত ‘আজি দুজনার দুটি পথ’ গাইত। লোকগান গাইত, ‘সুহাগ চান্দ বদনী’, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান গাইত শেকল ভাঙার। হারমোনিয়ামের উপর গানের সুর নাচত তা তা থৈ থৈ।

সুহাসের গান মানেই উন্মাদনা।

(দুই)

গানের রাজা শহর ছেড়ে গেল আমার আগে।

একই সঙ্গে ইন্টারভিউ দিলাম। সুহাস পেয়ে গেল চাকরি।

গ্রামীন ব্যাঙ্কের হাতিছড়া শাখার থার্ড অফিসার।

ধূমধামের মটুক মাথায় দিয়ে বৌঠানকেও নিয়ে গেল একদিন। এক সাক্ষাৎকারে পৃথক ফল হল না। আমিও তৃতীয় অফিসার হয়ে চলে এলাম হাতিছড়া।

রিনা তখনও মনস্থির করতে পারেনি বলে বৌঠানের পাশেই পেলাম বাসস্থান। বিয়ে না করার যৌতুক পেলাম বছর কুড়ির কুচকুচে যুবক মঙ্গালাল। ব্যাঙ্কের ঝাড়পোঁছার জমাদার। সকাল রাতে আমার গেরস্থালির অভিভাবক। কাব্যপ্রকরণ মনোযোগী হয়েছি মঙ্গালাল গৃহশিক্ষকের নববিধানে। মঙ্গা যা রাঁধে তাতে গ্রাসের আগ্রহ হয় ক্ষুধার তাড়নায়। আর বৌঠান বাড়ির মাছের ঝোলবাটি চালান এর লোভে।

পোড়খাওয়া মেনুর প্রকোপে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কখনও সখনও। নিরাময়ের নিদানও থাকে মঙ্গালালের কাছে। পুকুর ছেঁচে নিয়ে আসে মাগুর মাছ, সঙ্গে কাঁচাকলার কাঁদি। পেটখারাপের মোক্ষম পথ্য, শুশ্রূষার বহর দেখে আমার আতঙ্কিত প্রশ্নে সহাস্য জবাব দেয় নিকষকালো ভৃত্য। বলে,

--- হামি পাকাবে কিন্তুক বাবু।

--- আবার কিন্তু কিরে? লেগে পড় লড়াইএ।

‘কিন্তু’র বহর দেখে আমার আতঙ্ক তখন ছুটির আনন্দে হাত পা ছুঁড়ছে। পথ্য হলেও তো কিছু মশলা পাতির দরকার। বাটতে তো হবে শিলনোড়ায়, মঙ্গার হলুদ বাটার ভার বইতে না পেরে

পাটার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে খান খান। এবার কী হবে তবে? সানন্দ উৎসাহে আমি তখন মঙ্গাকে উজ্জীবিত করি। বলি,

--- ডোন্ট ওয়্যারি মঙ্গাবাবু, আজ সব ছিঁড়িয়া হোই।

--- মতলব।

--- সব মশলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিবি।

সংক্রামিত খুশিতে মঙ্গা শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতার পরই থমকে যায়। বিষাদে মাথা নুয়ে যায়। বলে,

--- মরিচ অউবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা তেজপাতা উবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা। হলদিউবা ছিড়িয়া উবা কেমনেউবা দিমুউবা? ভাগ্যিস লবন ছেঁড়ার কথা বলেনি আমার বুদ্ধিমান পাচক।

হলুদহীন পথ্য কী আর মুখে দেওয়া যায়?

হরিমটর থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করে বৌঠান তার মিঠে হাতের মহাভোজে। কৃতজ্ঞতায় বৌঠানকে বলি,

--- মঙ্গাকে নিয়ে কী যে করি বলো তো?

বৌঠান বলে,

--- পুজোর আগেই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেব।

--- সে তো অনেক দূর। আর বর্তমান?

--- যেমন চলছে চলুক, কাটাখাল, লালাবাজার রেলপথ। এ বাড়িতে কাঁচাপোড়া দুবেলা, ওবাড়ির দুবেলা। বন্ধুর বাড়িতে পাকাপাকি থাকলে তো আর মান বাঁচে না!

--- তা কেন? ব্যাঙ্কের কোয়ার্টারটা হাতছাড়া হলে কোথায় থাকব? বিকল্প ব্যবস্থার পর?

--- সে যে বললে অনেক দূর?

--- আসলে আলাদা একটা ঠেক থাকলে দু বন্ধুতে মাঝে সাঝে ---তুমি তো আবার ওসব পছন্দ করো না?

--- কী সব?

--- খাবে নাকি একদিন?

--- খেতে পারি। তবে শুধু তোমার সঙ্গে।

--- কেন? সুহাস কী অপরাধ করল?

--- ও মাতাল হয়ে যায়।

--- আমি যে হই না তোমায় কে বলল?

--- মনে আছে কলেজে সরস্বতী পুজোর পরদিন খেয়েছিলে আর শুধু মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিলে?

---তখন থেকে টার্গেট করেছ?

--- সুহাস খুব মাতলামি করছিল, আর তুমি ঢুলু ঢুলু চোখে হাসছিলে। সত্যি করে বলো আমায় দেখোনি সেদিন?

--- দেখো, কবি আর নাটুকেরা বরাবরই একটু ভীতু প্রকৃতির, আর গায়করা হয় ডাকাবুকো, তাই তাকাই নি, কবিতা লিখে থাকতে পারি অবাক চোখের।

(তিন)

তখনকার দিনে ছাপমারা হয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। কলেজ থেকে পাড়ায়, পাড়া থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়ে জুটির নাম। রামনগর, মেহেরপুর রিক্সায় দেখার সত্য অসত্য গল্পও জুড়ে যায়। আমার কপালে জুটে রিনা। বিয়ে অব্দি জড়াতে আরো বছর খানেক, অসবর্ণ বিয়ের অনেক কাঠখড়। ধক করে জ্বলে উঠবে যখন যজ্ঞানি, তখনই বিয়ে। তাই সময় কাটানোর মাঝামাঝিতে বৌঠান মাঝারি আঁচে হৃদয় পোড়ায়। নরম ব্যথায় কাতর হই। বলি,

---সবচে ভাল হয় বৌঠান, তুমি কদিন মঙ্গাকে ট্রেনিং দাও। শিক্ষান্তে একদিন তোমাদের দিয়ে হোক না মঙ্গালালের নবহস্তগ্রহণ?

--- শেখাতে হলে মঙ্গা কেন? একটা ঢাকঢোল সানাই এর নেমন্তন্ন হোক না?

--- হবে হবে। সব হবে। সমাজ একটু নড়ে চড়ে বসুক। কায়স্থ বাড়িতে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ের স্বীকৃতি আসুক।

--- ও, রিনারা তো আবার ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ! তাতে কী? আজকাল ওসব নিয়ে কেউ ভাবে না।

--- রিনার বাবা ভাবেন না, মা বেঁকে আছেন। না করছেন না সরাসরি, রিনাকে মানসিক নির্যাতন করছেন, আচ্ছা খেলোয়াড় এই বাবনি---

--- জিততেই হবে কেন? রিনাকে আমি একবছর সময় দিয়েছি শূদ্রাণী হওয়ার।

---বোকা প্লেয়ার! সময়মতো ঘুটি বদলে ফেলতে পারলে না? সাদা ঘুঁটিতে খেললে কোনও প্রবলেম ছিল না। সুহাসকে ছেড়ে চলে আসতাম। বামুন কায়েতের ঝামেলা ছিল না।

--- আসবে? এখনও উপায় আছে। একটা মামলা ঠুকে দাও।

--- ঠুকব তো ঠিকই। তখন পিছিয়ে এলে চলবে না। আপাতত রিনা বেচারির ওয়েট লিস্টটা কনফার্ম করি। পুজোর মধ্যেই সব ঠিক করে দেব। বলো রাজি তো?

বৌঠানকে বলি,

--- রাজি না হয়ে পারি? ‘তুমি আছো বলে মেঘে জল, তোমারি ইচ্ছায় সমস্ত নাস্তিক শক্তি ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়’।

(চার)

বৌঠানের কেরামতি আছে বটে!

শুধুমাত্র কথার টানেই থেকে গেলাম হাতিছড়া গ্রামে। পুজোর কদিন সবাই মিলে শিলচর বাতিল করলাম। মূল প্রস্তাব ছিল সুহাসের। সুহাস বলল,

--- এবার একটু অন্যরকম হোক। গ্রামেই কাটিয়ে দিই ছুটির কদিন, কী বলিস?

আমার একটা প্রাথমিক প্রতিরোধ ছিল। বলেছিলাম,

--- মাথা খারাপ। আর্যপট্টি, প্রেমতলা, অম্বিকাপট্টি ছেড়ে পুজোয় থাকব এই ধেধধেড়ে হাতির দেশে? শনিবার রিহার্সাল দেব বলেছি আর্যপট্টিতে। অঙ্গার নামাবে পরেশদা। আর তোর তো কথাই নেই। গায়ক সুহাস চৌধুরী থাকবে না, হয় নাকি? তার ওপর বৌঠানের বাপের বাড়ি? নতুন জামাই তুই? বিরাট ব্যাপার।

--- আমার কোনও অসুবিধা হবে না। বাড়িতে জানে কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একবার যখন স্থির করেই ফেলেছে, তখন যাবে না, দেখে নিও। তুমিও থেকে যাও না, প্লীজ!

বৌঠানের দীর্ঘায়ত 'প্লীজ' এবং অন্যান্য কার্যকারন মিলিয়ে, সুহাসের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাই। প্রিয়বন্ধু সুহাস একদিকে, বৌঠান তো এখন আমার নেশা। ছেড়ে থাকতে মন চায় না। মা বাবাকে দাদার বাড়ি দিল্লিতে পাঠানো গেল। রিনাকে অপেক্ষায় রেখে আমি থাকলাম হাতিছড়া। গোল্লায় গেল নাটক। কবিতা লেখার নিরিবিলিও কেড়ে নিল বৌঠান।

বিবিধপদের রান্নায় জমে গেল সপ্তমীর সকাল সকাল দুপুর। বেশ কিছু হাতখরচ দিয়ে মঙ্গালালকে ছুটি দিয়ে দিলাম বৌঠানের পরামর্শে।

(পাঁচ)

শরতের পূর্ণিমাপথে অনেকটাই এগিয়েছে হাতিছড়ার সন্ধ্যা।

দুদটো লাল বাইক বেয়ে আমরা বেরোলাম পুজো দেখতে।

সুহাস আর বৌঠান একাটায়।

আমি আমার লালপরিতে একা।

একা আমার জন্য আফসোস হলো বৌঠানের, সুহাসকে বলল,

--- চলো যাই দুজনে। শিলচর থেকে উঠিয়ে আনি রিনাকে।

সুহাসও বলল,

--- তাই চলো। তুই থাকবি, না যাবি? বরাক ব্রিজের এপারে থাকবি। সংযুক্তাকে এনে উঠিয়ে দেব তোর সওয়ার।

মনটা একটু সংরাগে সুখি হতেই ভাঙা শামুকে হোঁচট খায়।

মনোদুঃখে বলি,

--- পারবি না দোস্ত। আমার শাশুড়িকে দেখলে, তোদেরই শ্বাস উড়িয়া যাইবে। দাঙ্গা বাঁধিয়া ফেলবেন মহিলা।

মামাবাড়ির আবদার? ছমাস হয় শিলচর ছেড়েছি। সুহাস চৌধুরীকে চেনে না তোর শ্বশুরবাড়ি? এমন ট্রিট করব না?

ক্ষ্যাপা স্বামীকে সামাল দেয় বৌঠান। বলে,

--- তুমি মহাবীরকে শিলচরে সবাই চেনে। বীরত্ব দেখিয়ে লাভ নেই। এরচে চলো কোথাও বসে একটা সমাধান সূত্র বের করা যাক।

তাই পুজোর প্যান্ডেলে না গিয়ে আমরা যাই দিঘিরপার। পুজোর ছুটি না পড়লে, আর বৌঠানের প্রস্তাব না থাকলে দেখা হত না এমন সুন্দর জলাধার! গোলাকার জলরাশিকে ঘিরে রেখেছে চা বাগান।

সাহেব আমলে বাগান বাবুদের উদাসী মনের ঠিকানা ছিল দিঘিরপার। অনেকগুলো পাথর সাজানো পুকুর ঘিরে, ভটভটির আওয়াজ থামিয়ে সুহাস বলে,

--- নে, এবার একটা কবিতা লিখে ফেল জমজমাট। শতক্রতুতে ছাপিয়ে দেব।

--- শতক্রতু আবার কবিতা ছাপায় নাকি?

--- কবি হয়ে খবর রাখিস না? দুই সম্পাদকের একজন তপনদা কবি; মন্টুদা গল্পকার। ফেরারী লিখলি না?

--- ধুস, সে তো শেখর দাস।

--- ও, মন্টুদা লিখেছে ‘ছারপোকা’।

--- ঠিক আছে। এখন আর ছারপোকার কামড় খেয়ে লাভ নেই। ওদের আমি চিনি আমার কবিতাও ছাপিয়েছে। এবার একটা গান গা দেখি জমিয়ে। ডুয়েট।

--- ডুয়েট? তুই গাইবি নাকি?

--- কেন? বৌঠান গাইবে। তোরা একসঙ্গে স্টেজে উঠলে কী দারুণ ব্যাপার হত বল তো শিলচরে?

--- মিতু এখন গায় না।

--- কেন গাও না বৌঠান? বৌঠানের গলায় একটা অন্য মাধুর্য আছে, যাই বলিস। কতদিন শুনি না, গাও না বৌঠান? তোমায় একটা ধলা ফকফকা চাঁদ কিনে দেব আটদিন পর কোজাগরীতে গিফট।

--- প্লিজ আজ জ্যোৎস্নারাতে গাইতে বলিস না। ওকে গাইতে বল। বৌঠান এতক্ষণ সুহাসের স্ত্রী, আমার বৌঠান ছিল, যেমন থাকতে হয়। গানের কথায় হঠাৎ আলাদা হয়ে যায়। ছিটকে আসে ওর প্রত্যাখান, বলে,

--- আমি গাইব না।

সুহাসও তেজিঘোড়ার চাবুক ছুঁড়ে বলে

--- ঠিক আছে, আমি একাই গাইব। সুহাস চৌধুরী গানের জন্য দাম বাড়ায় না। চলো, ওয়ান টু এই দিনে মেঘলা...

সুহাস 'মাতাল সমীরণে'ও গায়। গান শেষ করে বলে, ---চল উধারবন্দে যেতে হবে। গোষ্ঠবিহারী সর্বজনীন এ গান আছে আমার সাড়ে আটটা থেকে ন'টা। আধঘণ্টা গাইব, চলে আসব। সুহাস বাইক স্টার্ট দিতেই বৌঠান আবার ভাবের ঘোরে বলে ওঠে,

--- আমি যাব না।

বৌঠানের এক নতুন রূপ দেখি সপ্তমী পুজোর রাতে। নিজের সিদ্ধান্তে যে কেউ এমন অমোঘ নির্ণয়ে জানাতে পারে দেখলাম। অবাক হয়ে শুনলাম রাগ, দুঃখ, অভিমান কিছুই বেরোল না কথায়। মনে হল যেন অনুনয় করছে সুহাসকে।

তিনশব্দের পাঁচিল ভাঙা সুহাসের কর্ম নয়। বলে

--- ঠিক আছে। তোমরা পুজোটুজো দীখে বাড়ি ফিরে যেও। আমি চলে আসব নটা সাড়ে নটায়।

(ছয়)

ভটভটিয়ে সুহাস চলে যেতেই আমরা দুজন অবাক বসে থাকলাম কিচ্ছুক্ষণ। যদিও সুহাসের এমন আচরণ আমার অজানা নয়। হুটহাট রাগ করা হলো সুহাসের অভিমান আভরণ। কোনও কারণে বৌঠানের ওপর খেপেছে। সে তো গেল সখা সমাচার। এখন এই বনপথে বন্ধুপত্নীকে নিয়ে কি করি?

আমাকে কিছু করতে হয় না। বৌঠানই বলে,

--- বন্ধুকে এখনও চেনো নি। আমাকে নিয়ে যেতে চায় নি। গানের কথা হলেই ওর সব অভিমান। কোনও ফাংশনটাংশন নয়। একা একা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ফিরবে ঠিক সময়ে। তারপর ভুলে যাবে সব, এমনই ভোলানাথ তোমার বন্ধু।

হাজার হোক সুহাস তো আমার বন্ধু। বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বললাম,

--- সুহাসও বলল, তখন গাইলে না কেন?

--- ওকে তাতিয়ে দিলাম। তাই তো গাইল অমন দরদ ভরে। বন্ধুকে যেমন চিনি, ছমাসের বন্ধুপত্নীকেও কম চিনি না। জানি, তাতিয়ে দেওয়া নয়। তাহলে কেন গান নিয়ে বিরোধ? বৌঠানকে বলি,

--- গান-পাগলা মানুষটাকে কেন তাতিয়ে দাও। সুহাসের গান শুনে আমিও যুদ্ধ জয় করতে পারি জানো? আমাদের কলেজের বন্ধু মধুকর পালকে তো চেনো। মহা কিপটে, বাজি ধরে ওর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ধার নিয়েছিল সুহাস। এখনও ফেরত দেয়নি। টাকা চাইলেই এক কলি গান শুনিয়ে দেয়। বলে কিস্তি দিলাম।

--- এত লোক- ঠকানো বুদ্ধি তোমার বন্ধুর?

--- এবার আমার কিস্তি দাও

--- আমার নাম করেও টাকা নিয়েছে নাকি?

--- মনে করো তাই! এবার একটা গান গাও আমার জন্য।

ভুল – না।

সে-রাতের কথা ভুলব না।

গোলাকার জলকে প্রদক্ষিণ করে বৌঠান গাইল গান।

যেন এক জলদেবী!

গান শেষ করে দুজনে উঠে এলাম পাশাপাশি পূজামণ্ডপে।

বৌঠান বলেছিল।

--- চলো বাড়ি যাই।

আমি বলেছিলাম,

--- না পুজো দেখব, যার জন্য থেকে গেলাম।

(সাত)

চা বাগানের কেউ না হলেও, চাকরি সূত্রে জেনে গেছি অনেক। বাগানের বাবু আর কুলির মধ্যে বিভাজন বিস্তর।

কিন্তু দুরগাপুজায় সব একাকার।

দিনের বেলা পূজা অর্চনা আর রঙবেরঙের পোষাকে থাকে জমজমাট। রাতেও হ্যাজাকবাতির আলোয় যাত্রাপালার ঝলমলানো পোশাক। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরির অন্তহীন অসিযুদ্ধ। যাত্রা চলছে বনবনিয়ে তরোয়ালের ঝনঝনানিতে।

গ্রামে না এলে দেখা হয় না মানুষের নিঃস্ব হওয়ার আনন্দ।

যাত্রা শেষ হলেই জুয়ার আসরও শেষ। তাই ঝাণ্ডিমুণ্ডার দানওলার পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রার আর দৃশ্যান্তর হয় না।

গরীব জীবনের মহার্ঘতম অধিকারও শেষ করে দেয় মানুষ জুয়ার আসরে।

মহাভারতের কালে তো বৌ বাজিরও রেওয়াজ ছিল!

সে-রাতে বৌঠানকে নিয়ে দেখেছিলাম যাত্রার প্রথমাংশ। সংযুক্তা-বেশি পুরুষ অভিনেতাকে দেখে তো বৌঠান অবাক। নটা, সাড়ে নটা কোথায়? সুহাস ফিরেছিল রাত বারোটায়।

একা একা যাত্রা দেখার কোনও উৎসাহ ছিল না। বৌঠানের জন্য মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল।

সুহাসটা কেন এমন পাগলামি করে?

একা ছেড়ে চলে যায়?

উৎসবের রাতে কার হাতে দিয়ে যায় নবপরিণীতা? বৌঠান কেন বলে আর গান গাইবে না?

জুয়ার আসরে অসহায় মানুষের হেরে যাওয়া দেখতে দেখতে ইচ্ছে হলো, আমি কেন কিছু হারি না?

বৌঠানের দুঃখ কি বাজি ধরবে জুয়াওলা?

আমার ইস্কবনের রানির জন্য বাজি ধরতে পকেটে হাত দিই। কোথায় ধরব বাজি? আমার কালোপানের ঘরে বাজি ধরে বসে আছে মঙ্গালাল। আমি হাত গুটিয়ে নিই।

সবাই হারে, একা মঙ্গা জেতে।

নেশায় টইটুম্বুর মঙ্গালাল আবার খেলতে চায়।

আর খেলা হবে না।

ভোর হয়ে গেছে। যাত্রা শেষ। সবাই বাড়ি ফিরছে।

(আট)

আমাকে ফিরতে হয় দিঘিরপার।

যেখানে শুরু হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যা উৎসব।

যেখানে ফেলে চলে গিয়েছিলাম আমার প্রিয়তমাকে।

আমার বুলেট।

ভটভটির গায়ে হাত দিয়ে শিশির মুছে বলি,

--- স্যরি বন্ধু। বৌঠানের জন্য তোমাকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম নির্দ্বিধায়।

আমি আর ফিরিনি কোয়ার্টারে।

বন্ধুর পিঠে চেপে বলি,

--- চলো রিনাবাড়ি।

এবার রিনার জন্য পুজোর বাকি দুদিন।

মাছিমপুর কালিবাড়িতে দুজনে বসেছিলাম অষ্টমী পূজার দিন। কেউ জানল না কিছু। শুধু দুজনে। রিনা বলল, মানবে না কোনও বাধা। নবমীর দিন বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিল। সেদিনও দুজনে চলে গেলাম লাবক চা বাগান। রিনার জন্মস্থান। পাহাড়ের উপর হাসপাতালে কেটে গেল দিন। রিনা বলল,

--- বিয়ে কবে করবে, ঠিক করেছ?

আমি বললাম,

--- চলো না আজই কালীবাড়িতে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দি?

--- না, ওরকম না। বাড়ি থেকেই দেবে। যা আগুণ লাগিয়ে এসেছি। এখন তোমাকে বরাক নদী থেকে জল নিয়ে যেতে হবে শুধু। সত্যি তাই হলো। নবমীর রাতেই ওবাড়িতে প্রণাম সেরে দশমীর প্রস্তুতি সেরে এলাম। ওদের এখন মেয়ে বিদায়ের প্রতীক্ষা। হৃষ্টমনে দশমীর দিন ফিরে এলাম হাতিছড়া।

(নয়)

বৌঠানের উদ্বেগ দেখে মনে হল না জানিয়ে চলে যাওয়াটা ঠিক হয় নি। বিদ্রোহী মন বলল, কেন বলব? আমি আমার মর্জির মালিক। তোমাকে বলতে হবে কেন বৌঠান? তুমি আমার কে?

তোমার ভয়েই তো পালিয়েছি।

বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে এলাম।

বৌঠান বলছিল পুজোর মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

কথা রেখেছে বৌঠান।

দশমীর দিন সন্ধ্যেরাতে সবৌঠান এক বেনের পুঁটুলি এসে উঠল আমার ঘরে। সঙ্গে প্রভূত মদ্যপান রত, মানে হাড়িয়া খাওয়া মঙ্গালাল। বৌঠান বলল,

--- এর নাম জংলী। মঙ্গার বউ।

--- জংলী আবার কী নাম?

মঙ্গার নেশায় ভঙ্গ হয়। বলে,

--- কেন হবে না? হামরা জঙ্গলে থাকি। মঙ্গলবারে জনম হলো আমার, ওর ভি জন্ম মঙ্গলবারে। মঙ্গা মঙ্গলী হবেক নাই। মরদের নামে নাম হলে পাপ লাগবেক। মেম সাহেব বহুত সুন্দর নাম দিয়েছে জংলী। তুই না করিস না বাবু?

না আর করি কী করে? পূজার আগে দিয়েছিলাম দশটাকা। বিজয়ার দিন দিলাম আরো দশ, টাকা পেয়ে নেশার ঘোরে মঙ্গা আবার বায়না ধরল নতুন। বলল,

--- তুই ভি একটা নাম দে না বাবু। তোর গোড় ধরি।

মাতালের হাত থেকে বাঁচাতে, বৌঠানের জংলীকে দিলাম নতুন নাম। জয়া। বিজয়া দশমীর সঙ্গে মিলিয়ে।

নাম তো দিয়ে দিলাম খেলাচ্ছলে।

থাকতেও দিলাম কোয়ার্টারের একটা ঘরে। থাক না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই চমক।

কালো সবুজ আর লালের ছোপ ছোপ শাড়ির হাতে চায়ের কাপ। সারা শরীর ঢাকা। শুধু লালরঙের পেটিকটটা পায়ের পাতার উপর থেকে উঁকি মারছে। মাথায় ধ্যাবড়ানো সিঁদুরের ছোপ। কালোবরণ মুখখানায় বড় মায়াবী সৌন্দর্য। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিমার মুখ যেন অবিকল।

অযাচিত প্রভাতী চা দিয়ে যা শুরু হল, তা তো থামতেই চায় না। জলখাবার, দিনের খাবার, রাতের খাবার থেকে মশারি টাঙানোয় এক অদৃশ্য নৈপুণ্য কাজ করে। লক্ষ্মীপুজোর আগেই আমার কোয়ার্টারে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে এল।

বৌঠানকে জানালাম সমাচার। সরেজমিন দেখে বৌঠান জংলী জয়াকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করল।

আমিও কৈফিয়ত দিলাম। বললাম,

--- না বৌঠান, মেয়েটি অন্যরকম, বড় মায়াধারী, খুব ভাল। জংলী প্রশংসার এক একটি শব্দ তুলে বৌঠানের রসিকতায় মজা ছিল। একা যুবকের দুঃখী সময়কে রঙে রসে ভরে দিতে জংলীর যোগদানও কম নয়। এও এক নতুন পাওয়া। শহুরে চালাক মেয়ে তো নয়। যা করে তা প্রাণ ঢেলে করে।

কালো রঙের এই যৌবনবতী বধূর কথা রিনাকেও বলেছি। রিনা বৌঠানের মতো রসিকতায় তরল হয় নি। রিনা রেগেছে। বলেছে,

--- জয়া আর বৌঠান, তোমার ঐ আদরের নাম দুটোকে খুন করে তবে ঘর শুরু করব। আমাকে কিন্তু প্লিজ, ন্যাকামির কোনও নাম দেবে না বলে রাখছি। আমি রিনা, রিনাই।

(দশ)

রিনা একটু অসহিষ্ণু।

আমার কথা মানতে চায় না। আমি বলেছি, --- সময়কে তো মানতে হবে। তখন ছিল এরকম। তখন তুমি ছিলে না রিনা। রিনা বলে,

--- সময় কিছু নয়। মনটাই রাজা। মন দিলেই সময়, নইলে কিছুই নয়।

আমি বলি,

--- সময়হ সব। সময়ের উপর গাজোয়ারি করা যায় না।

হাতিছড়ায় সময়ের মাপ একটা তো ছিল। সেই মাপের সময় শহরে থাকলে, শিলচরে থাকলে কি তার অভিঘাত এক হত? হাতিছড়ার সময় ছিল নিরবচচ্ছিন্ন। ছিল একান্ত। ভিড়ভাট্টার সময় ছিল না বলে, বৌঠানকে নিয়ে একটা সুখের সময়, গুনান্বিত সময় কাটিয়েছি। খণ্ডে খণ্ডে সময় নিয়ে সাজিয়েছি বৌঠানকে। সাজিয়েছে এসে জয়া। মনের মাধুরী সাজানো আর শরীর অধিকারের মাত্রা যে ভিন্ন হয়, সে কী করে বোঝাই রিনাকে!

আর রিনার কথাকেও ভুল বলি কী করে? মন লাগালেই না, সময়ের গায়ে ইট কাঠ পলেস্তারা!

তাই বলি,

--- বাদ দাও সময়। সময়ের বদলে বলো বিশ্বাস। এবার ঠিক হলো তো?

--- না।

(এগারো)

আমার বিশ্বাস আর রিনার বিশ্বাস মেলে না।

প্রেমও নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে রিনা যথেষ্ট বিশুদ্ধবাদী।

আমি যেমন ঘনঘন প্রেমে পড়তে ভালবাসি, রিনা ঠিক তার উল্টো। ভক্তিমতী মহিলার মতো সে শুদ্ধতার আধার।

আমাকে অন্য রমণীতে আগ্রহী দেখলেই রাগে।

আমি লুকিয়ে রাখতে পারি না, স্ত্রীর কাছে মনের জানালা খুলে দিই যখন তখন। আর সত্য কথায় বিভ্রাট হয়।

টানাপোড়নের আমাদের দাম্পত্য এক সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলে থাকে। মধ্যবিত্তের সম্পর্ক তো? ছেঁড়ে না।

রোজগারের ধারা একমুখী বলে কি? হয়তো!

সন্তান এলে একটা নৈতিক বাধা থাকে।

আর ছাড়াছাড়ির পুরুষ মহিলাকে এখনও দুধে-ভাতে সমাজ ততটা সুনজরে দেখে না।

তাই, খোলামেলা কথা বলার ভুল শোধরাতে সচেষ্ট হই। কম কথা বলি।

মনের কথা তো নয়ই।

জানি, বৌঠানের কথা বললে এখনও রিনা রেগে যায়।

এমন কী জয়া নাম্নী আমার পরিচারক – পত্নীর কথাতেও। কেন রেগে যায়?

এ প্রশ্নের জবাবে রিনার চোখের কোন চিকচিক করে। বলে,

--- আমার বুঝি দুঃখ হয় না?

--- কিসের দুঃখ তোমার?

--- কি জানি?

সময় হারানোর কষ্টে রিনা কাতর হয়।

সেই সময়, আমার সঙ্গে না থাকার দুঃখ। অসহায় অতীতকে উপভোগ করতে না পারার দুঃখ।

আমি বলি মাঝে মাঝে এরকম কষ্ট পাওয়া ভাল। অজানা কষ্ট না থাকলে পানসে হয়ে যায় জীবন। রিনার চোখে চোখ রেখে একটা অনুনয় জানাই। বলি,

--- যাবে নাকি একবার? চলো যাই। ঘুরে আসি হাতিছড়া। তোমার সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে।

--- ডেকেছে কখনও যে যাব?

--- ডেকেছে, বারবার ডেকেছে।

--- সে তোমাকে, ওর প্রিয়জনকে ডেকেছে।

--- তোমার এই এক গোঁ। ঠিক আছে চলো, না ডাকতেই যাই। তোমার সেই হিংসার জংলীকেও দেখে আসবে। একটা মজার কথা বলব, রাগ করবে না, বলো?

--- বলো।

--- ওদের না কোনও ছেলেপুলে হচ্ছে না।

--- তো?

--- না। এই হারামজাদা মঙ্গালালটাও এমন ইডিয়ট। আমাকে অনেক ঠকিয়েছে। পূজা বোনাস থেকে একশ টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল শিলচর থেকে টেপ রেকর্ডার কিনে আনতে। একশ টাকায় হয় বলো? আমারই গচ্চা গেল। কিনে দিলাম। সঙ্গে একটা ক্যাসেটও দিলাম। যেটায় আছে ‘হাম কালে হ্যায় তো ক্যায়া হুয়া দিলওয়ালে হ্যায়’ ওকে শুনিয়ে গাইত সুহাস। ওর বউ গান জানে। গুনগুন করে গায়। অংশুমান রায়ের ক্যাসেট কিনে দিয়েছি জয়াকে। ঐ গানটা খুব শুনত আর গাইত, ‘হামার পুলার বিয়া হবে’। ওদের এই একটাই দুঃখ।

--- তুমি কী করে বুঝলে? এক বছর তো ছিল ওদের বিয়ের পর। ওরা হয়তো তখন চায়নি? এখন দেখবে ভরাগাগরি!

--- আরে না না, কুলি কামিনদের কী ওসব ভাবার সময় আছে? একটা মনের কথা বলব? রাগ করবে না?

--- তখন থেকে একটা একটা করে হাজারটা বলে ফেলেছ।

--- আমার না, খুব ইচ্ছে হত জয়ার কোলে একটা ফুটফুটে বাচ্চা তুলে দেওয়ার।

--- ছিঃ!

আবার ভুল করে ফেললাম।

মনের ভেতর তো অনেক কথাই আসে যায়। সব কথা কেন বলতে হবে? সেদিন ভুল করেছিলাম। রিনার সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছিল। কুরুচিকর মানসিকতার জন্য আমাকে ঘৃণা করেছিল।

(বারো)

ঘৃণা করলেও, রিনা সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হাতিছড়া যাবে। তার আগেই এল বৃষ্টি।

বৃষ্টি এলেই আর সুহাসের কোয়ার্টার দুটো বিভাজিত হয়ে যায়। দুটো টিলার মাঝখানের ছড়ায় ভরে জল। মুখোমুখি দুটো বারান্দা, তবু দূর হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝমঝমিয়ে পড়ছে বারিধারা। নিরালোক বারান্দায় বসে ভুলে গেছি চরাচর। ওপারের বারান্দায় এক অপার্থিব দৃশ্য! মেঘরঙা শাড়িতে এক উদাসিনীর চুল উড়ে যাচ্ছে মেঘের শূন্যে। আর ভিতর-বাড়ি থেকে ভেসে আসছে গান 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'।

গান কে গাইছিল ভিতর ঘরে?

সুহাস? নাকি আমার গাইছিল আবহগান?

তেমন দিন আবার ফিরে পাওয়ার লোভেই কি রিনাকে বললাম,

--- চলো। এমন দিনেই গেছিলাম হাতিছড়া। এপ্রিলের চার। দুবছর হয়ে গেল। সুহাস থেকে গেল গ্রামীণ ব্যাঙ্কে, আমি বাংলার অধ্যাপক হয়ে কাছাড় কলেজে। নতুন চাকরি আর বিয়েরও ছমাস হয়ে গেল। রিনার গায়ে বৃষ্টির ছাট ঘুরিয়ে দিয়ে বলি,

--- চলো একটা হাফ ইয়ার সেলিব্রেট করি হাতিছড়ায়।

--- হাতিছড়ায়? কোন দুঃখে? জোড়া পেত্নির পাল্লায় পড়ি আর কী?

রিনার গায়ে প্রেমতলা বাড়ির বৃষ্টির ছাট, আর আমি সিক্ত হই হাতিছড়ার ঝমঝম ধারায়। স্মৃতিরা সব থৈ থৈ নেচী বেড়াচ্ছে ছাড়ার জলে। রিনার তির্যক কথাকে মান্য করেই বলি,

--- এপ্রিলের চার থেকে মে মাসের চার পর্যন্ত টানা বৃষ্টি ছিল ছিয়াত্তর ইংরেজিতে। ব্যাঙ্কের সামনে পিচ রাস্তার উপর দিয়ে মস্ত মস্ত কৈ মাছের মিছিল। মঙ্গার তৎপরতায় টুকরি

ফেলে ধরা গোটাকুড়ি মাছ। প্রথম দিনেই বৌঠানের হাতে কৈ হাতে কৈ ভোজে মাত হয়ে গেলাম।

--- জানতাম কৈ মাছের গল্প বৌঠানে গিয়েই শেষ হবে।

--- তুমি আর সুহাস দুজনেই এমন কেন বলো তো? এমন সোজাসাপটা মানুষটাকে সন্দেহ?

--- সোজাসাপটা নয়, আমার সন্দেহ চালাক মানুষটাকে নিয়ে। তা সুহাস চৌধুরীর স্টোরিটা তো নতুন?

--- না, আমি নই গল্পের কেন্দ্রে। সুহাসও একটা অপদার্থ। বৌ ভাল নয়, তাই বৌ এর গান বন্ধ। বৌঠানের মনে অনেক কষ্ট!

(তেরো)

সব কথা বলিনি রিনাকে। সুহাসের গল্পে আমি আছি। আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল। মহাসপ্তমীর রাতে মাতাল হয়ে ফিরেছিল। বৌঠানের গায়ে হাত তুলেছিল। গানটান কিছু না। সুহাস ইচ্ছে করে আমাদের একা রেখে গিয়েছিল।

সব কথা রিনাকে বলা যায় না। সমঝতায় চলতে হয়।

দাম্পত্যের সমঝোতা।

সমাজে থাকতে হলে প্রতিপদে মানিয়ে নিতে হয়।

ভাল লাগে আমার বৌঠানকে, ভাল লাগে জয়াক। কিন্তু ওদের নিয়ে আমাকে থাকতে দেবে না সমাজ। কারণ আমি রিনার স্বামী।

এক ঘণ্টার দূরত্বে রয়েছে আমার মনের মানুষ; কিন্তু দেখা হবে না জীবনে। দেখা না হয় না-ই হল, রিনার সঙ্গে কেন শেয়ার করা যাবে না সম্পর্ক-কথা?

মানে এক, সম্পর্কে অন্য!

আমি দুরকম থাকতে চাই না।

মাঝরাতে তাই ঘুমন্ত রিনাকে জড়িয়ে ধরি সজোরে।

রিনা জেগে ওঠে, গভীর আদরে বলি,

--- তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না সোনা!

রিনা বুঝেছিল। আক্রমণে যায় নি।

বৌঠানের কথা বলিনি সেরাতে।

(চৌদ্দ)

মেঘ বৃষ্টির পর আবার শরৎ আসে।

বৌঠান আসে আমার বাড়িতে।

বৌঠানকে দেখে ভাল লাগে।

কমলা রঙের বোঁটায় অজস্র শিউলি ছড়িয়ে পড়ে প্রেমতলা বাড়িতে। প্রাক্তন মনো-ব্যথা ভুলে সুহাসের সঙ্গে বার নিঃশর্ত বন্ধুত্বে মুখর হই দুজনে।

বৌঠানের হাসি থেকে সেই দুঃখের পর্দাটা কিছুতেই সরে না।

চুপচাপ বেড়াতে আসার শান্তি কাটিয়ে চলেও যায়।

সুহাস অনেক কথা বলে, যেমন বলত। বলে,

--- তোর জংলীর কাণ্ড জানিস?

--- কী করে জানব? গেছি নাকি হাতিছড়া?

--- না নেই, আর হাতিছড়ায় নেই।

--- তবে কোথায়? মঙ্গা বদলি হয়ে গেছে? পার্টটাইমদের তো বদলি হয় না?

--- মঙ্গা আছে নতুন ডেপুটির বাহন হয়ে। 'ছিঁড়িয়া' রাঁধছে।

--- বৌঠানের একই ট্র্যাডিশন চলছে? শাক শব্জি তেল কই এর বাটি? কিছুক্ষণ নিরুত্তর সবাই। আমার পক্ষে দুজন, ওদের দুজন। অনেক কথার সমাধান হয় নীরবে। আমিই বলি আবার,

--- বল না রে বাবা! এত হেঁয়ালি করছিস কেন? মেয়েটা তো ভালই ছিল!

--- ভাল! ভাল হলে সাদাসিধে ছেলেটাকে ছেড়ে যায়? ওর খুব রূপের দেমাক ছিল! বুধিয়ার সঙ্গে ভেগেছে।

--- কে বুধিয়া?

--- তুই চিনবি না। বুধবারে জন্ম। পাতিছড়ায় থাকে জংলীর হিরো।

--- কিন্তু কেন গেল?

--- ওরকম যায় ওদের সমাজে।

অসহায় আমি হঠাৎ করে আমার উৎপাতের পরিচারক মঙ্গালালের সহকর্মী হয়ে যাই। আহারে! বেচারির নিশ্চয় মনটা ভেঙে গেছে?

বৌঠানের দিকে তাকাই। সুহাসের সব কথা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বৌঠান বলে দিক না, সব মিথ্যে!

বৌঠানও বলে,

--- সত্যি! ওদের সমাজে হয়!

--- আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না!

আমার স্বগত কথা বৌঠান শুনেও শুনল না।

শতক্রতু, শরৎ ১৪১৬।

*****

আউল ক্রীক সেতুর ঘটনা

"An Occurrence at Owl Creek Bridge"

By, Ambrose Bierce

(এমব্রোস বিয়ার্স)

অনুবাদ : রণবীর পুরকায়স্থ

উত্তর আলাবামার একটি রেল সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ, আনতদৃষ্টিতে কুড়িফুট নীচে খরস্রোতা জলরাশির দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। মানুষটির হাত দুটো তার পিছনে কব্জি দুটোতে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটি রশি তার গলায় শক্ত করে প্যাঁচানো। তার মাথার উপর একটি শক্তপোক্ত আডকাঠের সঙ্গে বাঁধা দড়িটি ঝুলে রয়েছে তার হাঁটুর সমানে সমানে। রেলের ধাতব লাইন ধরে রাখার পাটাতনের উপর কিছু খুচরো তক্তা পেতে দেওয়া হয়েছে তার ও তার ঘাতকদের পা রাখার জন্য। ফেডারেল আর্মির দুজন সাধারণ সৈনিক মোতায়েন রয়েছে এক সার্জেন্টের আদেশে, যিনি হয়তো আসামরিক জীবনে কোন শহর বা মহকুমার উপশাসক ছিলেন। স্বল্প দূরে আর একটি অস্থায়ী পাটাতনের উপর তার পদবিসুলভ উর্দিপরা একজন সশস্ত্র অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, সে ক্যাপটেন ।সেতুর দুপারে দুজন প্রহরী তাদের বন্দুক তাক করা অবস্থায় দাঁড়ানো, বন্দুক বাঁ কাধের উপর উল্লম্ব, হাতটি বুকের উপর থেকে ঘোড়ার উপর রাখা। এক পোষাকী এবং অস্বাভাবিক অবস্থান।তারা শরীরকে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। দেখে মনে হচ্ছে না সেতুর মাঝখানে কী ঘটছে তা জানা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তারা শুধু তাদের তির্যক অবস্থানে তক্তার পাদানির দুদিককে অবরুদ্ধ করে রাখছে।

দূরের দিকে দুজনের মধ্যে একজন প্রহরী ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, রেলপথ সোজা একশ গজ পর্যন্ত বনের দিকে গেছে, তারপর বাঁক ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। নিঃসন্দেহে দূরে আরো একটি চৌকি আছে। নদীর অপর প্রান্তে খোলা মাঠ।সামান্য খাঁড়াই ভূমিতে লম্বালম্বি গাছের গুঁড়ির বেড়া দেওয়া, বন্দুকের নলের জন্য অনেক ফুটো করা। এর মধ্যে একটি বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পিতলের কামানের মুখ বেরিয়ে আছে যা সেতুর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করছে । সেতু আর দুর্গের মাঝখানের ঢালু জমিতে রয়েছে দর্শকেরা, এক কোম্পানি পদাতিক সেন্য 'বিশ্রাম' অবস্থায় মোতায়েন রয়েছে। বন্দুকের কুঁদা মাটির দিকে। নলগুলি ডানকাঁধের দিকে সামান্য হেলানো, হাতদুটো বাটের উপর আড়াআড়ি রাখা। লেফটেন্যান্ট পদাধিকারী একজন সারির ডানদিকে, তার তরোয়ালের তীক্ষ্ণদিকটি ভূমিগত, আর তার বাম হাতটিও ডান হাতের উপর বিশ্রামে ন্যস্ত। সেতুর মাঝখানে চারজনের দলটি ছাড়া কেউই নড়ছে না। সেতুর দিকে তাকানো সেনা দলটির দৃষ্টিও পাথুরে, নিশ্চল। নদীটির দিকে মুখকরা প্রহরী দুজনও যেন সেতুর শোভাবর্দ্ধনকারী ভাস্কর্য। ক্যাপ্টেন লোকটি দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ অধীনস্তদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেছে কিন্তু কোন নির্দেশ দিচ্ছে না । মৃত্যু এমনই এক মহান অতিথি যখন আসে তার আগমন-বার্তা যথাবিহিত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে সবাই , এমন কী যারা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তারাও। সামরিক রীতিকানুনের শিষ্টাচারে নিশ্চুপ আর নীরব থাকাই অমিলের রকমফের এখানে ।

যাকেফাঁসি দেওয়ার জন্য বেঁধে রাখা হয়েছে তার বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর হবে। সে একজন অসামরিক ব্যক্তি, তার স্বভাবচরিত্র বিবেচনা করলে বুঝাই যায় সে এক তুলোর বাগানমালিক। তার চেহারার আদলও সুন্দর, খাড়া নাক, শক্তপোক্ত মুখমণ্ডল ও চওড়া কপাল। যেখান থেকে সোজা পিছনের দিকে চিরুনি করা দীর্ঘ কালো চুল তার কানের পিছনে মানানসই দীর্ঘ আলখাল্লার কলারের উপর গিয়ে পড়েছে। তার একটি গোঁফ এবং খোঁচাখোচা দাড়ি রয়েছে কিন্তু কোন জুলফি টুলফি নেই। তার চোখগুলি ডাগর ডাগর এবং ঘন কালো। মুখে এমন দয়ালু ও অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি, যে ভাবাই যায় না তার কাঁধের উপর ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। স্পষ্টতই এটা কোন সাধারণ হত্যা নয়। উদারনৈতিক সামরিক আইনে সমাজের অনেক ধরণের মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার ধারা রয়েছে এবং যেখানে ভদ্রলোকদেরও বাদ দেওয়া হয় নি।

সব প্রস্তুতি শেষ, দুজন সাধারণ সৈনিক একপাশে সরে যায় এবং তারা যার উপর দাঁড়িয়েছিল সেই কাঠের তক্তাও সরিয়ে নেয়। সার্জেন্ট ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ও স্যালুট করে।এবং সেই অফিসারের ঠিক পিছনে স্থান করে নেয়, ফলত সেও এককদম ঘুরে যায় । এসব স্থান পরিবর্তনের ফলে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষ আর সার্জেন্ট একই তক্তার দুইপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে যা সেতুর তিনটি রেল ধরে রাখা আড়কাঠের ব্যবধানে স্থিত। অসামরিক লোকটি একেবারে শেষপ্রান্তে। কিন্তু পুরো নয়, চতুর্থ পাটাতনের কাছাকাছি। এই কাঠের টুকরোটি ক্যাপটেন এর ওজন সঠিক ধরে রেখেছিল, সেটি এখন সার্জেন্টের কবলে। প্রথমজনের কাছ থেকে সংকেত পেলেই সে একপাশে সরে যাবে আড়কাঠের তক্তাও উল্টে যাবে এবং ফাঁসির আসামি লোকটিও দুই পাটাতনের মাঝখান দিয়ে নীচে পড়ে যাবে। অতি সরল এবং কার্যকরী তার এই বিচারের ব্যবস্থাপনা প্রশংসাযোগ্য তো বটেই। তার মুখ ঢাকা হয়নি এমনকি চোখেও কোনপট্টি বাঁধা হয় নি। সে এক মুহূর্তের জন্য তার নড়বড়ে পায়ের দিকে তাকায়, তারপর স্থিরদৃষ্টিতে বিস্ময়ে তার পায়ের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া উত্তাল জলরাশিকে দেখে। নৃত্যরত একটুকরো কুটো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং তার চোখ কাঠের টুকরোটির স্রোতে বয়ে যাওয়া দেখতে থাকে। মনে হয় যেন কী ধীরে বইছে জল! কী অলস জলধারাবাহী এই নদী!

সে তার শেষ ভাবনাচিন্তাকে স্ত্রী এবং সন্তানে কেন্দ্রীভূত করতে চোখ বন্ধ করে। এই জল প্রভাতী সূর্যের আলোয় সোনার বরণ। অদূরে কুয়াশাভাঙা ঢিবির নীচে নদীর পারের দূরবর্তী দুর্গ, সেনাদল, একটুকরো জলপ্রবাহ এসবই তাকে বিরক্ত এবং বিহ্বল করছে। এখন আবার সে আর এক নতুন উৎপাতের মুখোমুখি হয়। প্রিয়জনদের চিন্তার মাঝখানে একটা শব্দ যা সে অবহেলা করতে পারে না, বুঝতেও পারে না কিসের ধ্বনি। তীক্ষ্ণ ধাতব ঘর্ষণজাত শব্দ যেন কামানের হাতুড়ি পড়ছে নেহাইর উপর। যার ধ্বনি একই বৈশিষ্ঠে বেজে যাচ্ছে বারবার। সে অবাক বিস্ময়ে ভাবে এটা কী।এটা কী অপরিমেয় দূরত্বের, না খুব কাছের। মনে হচ্চে যেন দুটোই। নির্দিষ্ট গতিতে বাজছে কিন্তু এতধীরলয়ে যেন কেউ মৃত্যুঘণ্টা বাজাচ্ছে। সে প্রতিটি ঘা এর জন্য অপেক্ষা করে অধৈর্যে। সে জানে কেন এ অপেক্ষা। কিসের আশঙ্কা। নীরবতার দূরত্ব দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে আর এই দেরী তাকে পাগল করে তোলে। এই বিশাল বিরল ব্যবধানে শব্দের শক্তি ও তীক্ষ্ণতা যেন বেড়ে যাচ্ছে অনেকগুণ। তার কানের উপর ছুরিকাঘাতের মতো আঘাত করছে শব্দ। সে ভয় পাচ্ছে,সে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। সে যা শুনছে তা তার ঘড়ির স্পন্দন।

সে আবার তার বন্ধ চোখ মেলে নীচে বয়ে যাওয়া জলরাশি দেখে।আমি যদি আমার হাত দুটো খুলতে পারতাম, সে ভাবে। আমি এই দড়ি দড়া খুলে নদীতে ঝাঁপ মেরে দিতাম। ঝাঁপ দিয়ে আমি বুলেটের হাত থেকে তো বাঁচতে পারতাম। আর প্রাণপণ সাঁতরে ওপারে পৌঁছে যেতাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে যেতাম। আমার বাড়ি, ধন্যবাদ ভগবান, আমার পরিজনরা এখনও তাদের সেনাবাহিনীর হিসেবের বাইরে। আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা এখনও আক্রমণকারীদের থেকে অনেক দূরে।

এইসব ভাবনাগুলি যখন এখানে শব্দরূপ পাচ্ছে, ফাঁসির আসামীর মাথায় ঘুরপাক খাচ্চে এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই ক্যাপ্টেন সার্জেন্টের দিকে ইশারা করে। সার্জেন্ট একদিকে সরে যায়।

(২)

পেটন ফারকুহার একজন স্বচ্ছল তুলোর বাগানমালিক। বেশ প্রাচীন এবং সুসম্মানের অধিকারী এক আলাবামা পরিবারে তার জন্ম। নিজে দাসমালিক হওয়ায় অন্য দাসমালিকদের মতো সে একজন রাজনীতিবিদও বটে। এবং স্বাভাবিকভাবে একজন খাঁটি বিচ্ছিন্নতাবাদি ।সে আমেরিকার দক্ষিণাংশের অধিকারের জন্য নিবেদিত প্রাণ এখানে বাহুল্য মনে হতে পারে তবু জানা দরকার ওদের স্বেচ্ছাচারী চরিত্রগত অবস্থার জন্য সে সামরিক বাহিনির চাকরি নিতে চায়নি। যদিও ওরা শেষপর্যন্ত অসম যুদ্ধে পরাস্ত হয় করিন্থ হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সে অসম্মানজনক অক্ষমতায় রাগে, আর রুদ্ধ ক্ষমতা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সৈনিকের মহত জীবন, স্বাতন্ত্র্য ও সম্মানের জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে জানত সুযোগ আসবেই এবং তা আসেও যুদ্ধকালীন সময়ে। ইতিমধ্যে সে তার পক্ষে করনীয় সব রকম কাজই করেছে। দক্ষিণের স্বাধীনতার জন্য কোন কাজই ছোট নয় জেনে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোন ঝুঁকিই এমন বিপদসংকুল নয় একজন অসামরিক ব্যাক্তির কাছে যে মনের দিক থেকে সৈনিকের মতো সঙ্গতিপূর্ণ এবং খুব বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়েও সম্মতি দেয়। প্রেমে এবং যুদ্ধে সব কিছুই ঠিকঠাক এই মারাত্মক সরল প্রবাদবাক্য নির্ভর করে।

একদিন বিকেলে ফারকুহার এবং তার স্ত্রী বাগানবাড়ির মুখে একটি মরচেধরা বেঞ্চে বসেছিল, এক ধূসর উর্দিপরা ঘোড়সাওয়ার সৈনিক তাদের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে জল খেতে চাইল। শ্রীমতি ফারকুহার খুব খুশিমনে নিজহাতে তাকে জলপান করালো। যখন সে জল

আনতে ভিতরে যায় তখন তার স্বামী সেই ধূসর ঘোড়সাওয়ারকে আগ্রহভাবে যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করে ।

"ইয়াঙ্কিরা রেলপথ মেরামত করছে" মানুষটি বলল, "এবং আরো অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্চে। তারা আউল ক্রীক সেতু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সব ঠিক ঠাক করে উত্তরপারে একটা কাঠের দুর্গও বানিয়ে নিয়েছে। ওখানকার সামরিক অধিকর্তা কিন্তু একটি অধ্যাদেশ জারি করে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে, আদেশে বলা হয়েছে যে কোন অসামরিক ব্যাক্তিকে যদি রেলপথ তার সেতু, সুড়ঙ্গ বা রেলগাড়িতে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কিংবা বাধার সৃষ্টি করতে দেখা যায় তবে তাকে কালবিলম্ব না করে বিনাবিচারে ফাঁসি দেওয়া হবে, আমি নিজে দেখেছি অধ্যাদেশ।"

"আউল ক্রীক সেতু এখান থেকে কতদূর হবে?" ফারকুহার প্রশ্ন করে,

"প্রায় ত্রিশমাইল।"

"খাঁড়ির এদিকে কোন সেনা নেই?"

"রেললাইনের পাশে আধমাইল দূরে একটা ফাঁড়ি চৌকি আছে। আর একটিমাত্র প্রহরী সেতুর শেষপ্রান্তে।"

"মনে করোএকজন অসামরিক লোক কিম্বা ফাঁসি যেতে চায় এমন খ্যাপা কেউ ফাঁড়িচৌকি ফাঁকি দিয়েপ্রহরীর অসতর্কতায় যদি চলে যায় সংরক্ষিত অঞ্চলে।" ফারকুহারহাসতে হাসতে বলে,

"তার কী হবে ?"

সৈনিকটি তির্যকভাবে জবাব দেয় 'মাসখানেক আগে আমি ওখানে ছিলাম।' সে বলে, "আমি গত শীতের সময় দেখেছি ওখানে সেতুর খিলানে অনেক কাঠকুটোর পাহাড় জমে আছে। এখন ওগুলো জ্বলবে পাটখড়ির মতো।"

গৃহকর্ত্রী ইতিমধ্যে জল নিয়ে ফিরেছেন, যা সৈনিকটি পান করে। সে অতি ভদ্রভাবে তাকে ধন্যবাদ দেয়, তার স্বামীকেও শরীর নুইয়ে অভিবাদন জানায় এবং ঘোড়া ছুটিয়ে চলে

যায়। একঘণ্টা পর, রাত হওয়ার পর, সে আবার বাগানে সামনে দিয়ে ফিরে যায়। উত্তরের দিকেই সে যায়, যেদিক থেকে সে এসেছিল। সে ছিল একজন ফেডারেল গুপ্তচর।

(৩)

পেটন ফারকুহার যখন সেতু থেকে সোজা নীচের দিকে পড়ে যায় তখন তার চৈতন্য লোপ পায় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া মানুষের মতো পড়ে থাকে। এরকম অবস্থা থেকে সে অনেক পরে জেগে ওঠার পর কণ্ঠে এক ব্যথার তীক্ষ্ণ চাপ অনুভব করে। শেষে এক দমবন্ধ অবস্থায় প্রগাঢ় এবং তীব্র ব্যথা তার কাঁধ ও গলা থেকে নামছিল তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেয়ে। ব্যথাগুলি তার শরীরের শাখাপ্রশাখায় ধুকপুকিয়ে শব্দ করে যাচ্ছে অকল্পনীয় দ্রুততায়। মনে হচ্চে যেন দ্রুত ধাবমান আগুনের স্রোত অসহ্য তাপমাত্রায় তাকে দহন করছে। আর তার মাথায়, তার চেতনায় কিছুই নেই। কি এক জটপাকানো সম্পূর্ণতার ভার। এসব ব্যাথার সঙ্গে তার ভাবনা চিন্তার কোন ছাপ নেই। তার প্রকৃতিগত বুদ্ধিবৃত্তিও ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার এখন শুধু অনুভব করার শক্তি অবশিষ্ট রয়েছে যাএক পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাতার কাছে। সে শুধু অনুভব সচেতন। সে এক উজ্জ্বল মেঘের আলোয় ঘিরে আছে, যার মধ্যে আছে তার জ্বলন্ত হৃদয়, অবয়বহীন ও অবাস্তব। সে অচিন্ত্যনীয় ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে চলেছে বিশাল এক ঘড়ির দোলকের মতো। তখন সহসা এক সঙ্গে দুরন্ত তাৎক্ষণিকতায় বিশাল জলরাশির মতো শব্দ করে তার ভিতরকার আলো উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। এক সন্ত্রস্ত গর্জন তার কানে বাজে আর চরাচর অন্ধকার ও শীতল হয়ে যায়। তার চিন্তার শক্তি আবার ফিরে আসে। সে বুঝতে পারে দড়ি ছিঁড়ে গেছে এবং সে নদীতে পড়ে গেছে। অতিরিক্ত কোন দমবন্ধ অবস্থা নয়, ঘাড়ের উপর ফাস লাগানোর দড়িটা ইতিমধ্যেই তার শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে এবং ফুসফুস থেকেও জল বেরিয়ে গেছে। নদীর মাঝখানে ফাঁসিতে মৃত্যু। তার কাছে বিষয়টা খুব হাস্যকর মনে হয়। সে চোখ খোলে অন্ধকারে আর দেখে তার উপর একটুকরো মৃদু আলোর রশ্মি। কিন্তু অনেক দূরের, অগম্য অপ্রবেশ্য। সে ডুবেই যাচ্ছে, কারণ আলো অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হচ্চে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বিন্দুতে পর্যবসিত হচ্চে। তারপর আবার বাড়তে থাকে এবং উজ্জ্বলতর হয় এবং সে বুঝতে পারে সে জাগছে, জলের উপরে উঠছে, বিরক্তি

সহকারেই সে বুঝতে পারে কারণ সেতো বেশ স্বস্তিজনক অবস্থায়ই আছে এখন। "ফাঁসি দেওয়া এবং জলে ডুবানো" সে ভাবে "ব্যাপারটা খুব খারাপ নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই গুলি খেয়ে মরতে চাই না। না গুলির আঘাতে নয়; ওটা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

খুব ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা নয়, কিন্তু তার হাতের একটা তীব্রব্যথা জানান দেয় সে তার হাত মুক্ত করতে চাইছে। সে তার লড়াই এ মনোনিবেশ করে, যেমন একজন অলস মানুষ জাদুকরের কসরত দেখে অবাক হয়, কী ঘটবে তার প্রত্যাশা ছাড়াই । কী দারুণ প্রচেষ্টা ! কী দুর্দান্ত, কী অমানুষিক শক্তি! আহ কী দারুণ নৈপুণ্য! সাবাস, বেশ তো! রশারশি খুলে যায়, তার হাত দুটো আলাদা হয় এবং উপরের দিকে ভেসে ওঠে, হাতগুলো টিমটিমে আলোর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়। সে নবীন উৎসাহে দেখে একটাকে, তারপর অন্যটা দিয়ে কাঁধের উপর থেকে দড়িটা সরিয়ে দেয়। তারপর ওটাকে ছিঁড়ে সজোরে একদিকে সরিয়ে দেয়। চাঁদের আলো জলের উপর প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনে হয় জলসর্প হেলেদুলে যাচ্ছে। "ওগুলো যেমন আছে রেখে দাও, ওগুলো যেমন আছে রেখে দাও' সে ভাবে এই কথাগুলি যেন কেউ তার হাতদুটোকে বলছে। কারণ দড়ির বাঁধন খুলার পর সে অমানুষিক ব্যথায় কাতর হয়েছে যা সে এর আগে কখনো অনুভব করে নি। তার ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা, মস্তিষ্কে আগুন। তার হৃদয় যেটা খুব দুর্বল ভাবে দপদপ করছে সেও একটা মস্ত বড় লাফ দিয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। তার সমস্ত শরীরের হাড় মজ্জা নড়বড়ে হয়ে গেছে, পেশিগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছে সহানুভূতিহীন ব্যথায়। কিন্তু তার অবাধ্য হাতগুলি তার আদেশের কোন মূল্য দেয় না। তারা জলের উপর নিম্নমুখি সাঁতার কাটতে থাকে যাতে সে উপরে ভেসে উঠতে পারে। সে অনুভব করে তার মাথা উঠে আসছে, তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছে সূর্যরশ্মিতে, তার বুক ফুলে উঠছে প্রশ্বাসের দুলুনিতে। এবং শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে তার ফুসফুসে ভরে যায় অনেক শুকনো বাতাস। সে যা সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেয় এক তীক্ষ্ণ চীৎকারে।

সে এখন তার ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অধিকারে । তারা অবশ্যই অতিপ্রাকৃত ভাবে শান্ত এবং সচকিত। কিছু কিছু বিষয় তাকে এত বিরক্ত করছে যে তার জৈবিক প্রণালী দুম করে অতি তীক্ষ্ণধি এবং পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে। তারা সব কিছু দেখতে পারছে শুনতে পারছে নিরবচ্ছিন্ন, যা তারা এর আগে পারে নি। সে বুঝতে পারছে যে জলের ফোঁটা তার মুখের উপর পড়ছে এবং যখন পড়ছে তখন প্রতিটি ফোঁটার আলাদা শব্দ সে শুনতে পারছে। সে নদীর ওপারে জঙ্গলের

দিকে তাকিয়ে দেখেছে। দেখেছে প্রতিটি গাছপালা, তাদের উপর প্রত্যেকটি পোকা মাকড়, ঘাসফড়িং, সুন্দর দেখতে সব মাছি, ধূসর মাকড়সার জাল এডাল থেকে ওডালে বিস্তৃত। সে প্রতিটি ঘাসপাতার উপর পড়া স্বচ্ছ শিশিরবিন্দুগুলি পর্যন্ত দেখতে পারছে। ঘূর্ণিজলের উপর নাচতে থাকা ডাঁশমশার ডানা ঝাপটানো, জলমাকড়সার লম্বা লম্বা পায়ের ঝাঁপ, দাঁড়টানার মতো শব্দ করে নৌকো বাইছে যেন।সব মিলিয়ে এক সঙ্গীতের মূর্ছনা। একটি মাছতার চোখের নীচ দিয়ে চলে গেল এবং সে শুনল জল আলাদা করে তার শরীরী চলে যাওয়ার শব্দ ।

সে নদী থেকে উপরে উঠে এলো, এক মুহূর্তে দৃশ্যমান দুনিয়া মনে হল যেন ঘুরছে একটা ছোট্ট পাকে, সে নিজে তার প্রধান কেন্দ্রে। এবং সে দেখে এক সেতু, দুর্গ। সেতুর উপর সৈনিকরা, ক্যাপ্টেন সার্জেন্ট ও দুজন সাধারণ প্রহরী, তার ঘাতক দল। তারা নীল আকাশের গায়ে ছায়া ছায়া হয়ে আছে। তারা চিৎকার করছে তার দিকে তাকিয়ে। ক্যাপ্টেন তার পিস্তল বের করছে, কিন্তু চালাচ্ছে না, অন্যরা অস্ত্রহীন। তাদের চলাচল অস্পষ্ট এবং বীভৎস, তাদের দেখতেও লাগছে বিশাল।

হঠাৎ সে একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পায় এবং কিছু একটা ছরাত শব্দে জল ভেদ করে যায় তার মাথার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে। তার মুখের উপর ঝাঁঝারির জলের মতো ছড়িয়ে যায়। সে আবার দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনে এবং দেখে একটি প্রহরী তার কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঘুরছে। তার নল থেকে নীল রঙের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। জলের মধ্যে থাকা মানুষটি দেখে সেতুর উপরে লোকটার চোখ ঘুরছে , তার বন্দুকের আওতার ভিতর যা আছে সব দেখছে। সে দেখল লোকটার চোখ পাঁশুটে এবং তার মনে পড়ে সে কোথাও পড়েছে পিংলা চোখের মানুষের নিশানা পাকা হয় এবং সব বিখ্যাত লক্ষ্যভেদীরাই ওরকম। সে যাই হোক এটা তো ব্যর্থ হল।

একটা উল্টো স্রোত ফারকুহারকে অর্দ্ধেক ঘুরিয়ে দেয়, সে আবার দুর্গের অপর পারে জঙ্গলের দিকে তাকায়। একটা স্পষ্ট উচ্চস্বর একঘেয়ে গানের মতো বেজে ওঠে তার পিছনে জল ভেদ করে। অন্যসব অস্পষ্ট শব্দ ভেদ করে এমনকি বুদবুদের শব্দ যা ক্রমাগত তার কানে বাজছে সব কিছু ছাপিয়ে যাচ্ছে। যদিও সে কোন সৈনিক নয়, সে অনেকবার এরকম শিবির দেখে জেনেছে ঐ শব্দের উৎস, সুচিন্তিত নীরসশব্দভেদী মন্ত্রের মতো গমগমে শব্দের অর্থ। পারে দাঁড়ানো লেফটেনেন্ট তার প্রভাতী কাজকর্মে মগ্ন। কী শীতলতায় এবং নির্মমভাবে স্পষ্ট

শান্ত স্বরক্ষেপে সময়কেশাসন করে সতর্কতা জারি করে মানুষটি নিজের ভিতর শান্তি উপলব্ধি করে। কী নিখুত মাপা বিরাম নিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সেইসব নিষ্ঠুর শব্দগুলি,

"সাবধান কোম্পানি! কাঁধে বন্দুক তুলে নাও! প্রস্তুত হও! তাক করো। গুলি করো"!

ফারকুহার ডুব দেয়। যত গভীরে পারে সে ডুব দেয়। নায়াগ্রার মতো জল তার কানে গর্জন করে ওঠে। সে শুনতে পায় স্তিমিত বর্জনির্ঘোষের মতো গোলাগুলির শব্দ, আবার সে ভেসে ওঠে, উজ্জ্বল ধাতব আলোকরশ্মির সঙ্গে মিলিত হয়। এক এক করে পড়ছে, ধীরলয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে নীচের দিকে। কোনোকোনটি তার মুখ কিংবা হাত স্পর্শ করছে, তারপর গড়িয়ে পড়ছে তাদের অবতরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। একটা তার গলবন্ধনীতে, একটা কাঁধে নামে। এটা একটু অস্বস্তিকর তপ্ত এবং সে সেটা টেনে বের করে ।

সে যখনই পারের দিকে ওঠে শ্বাস নেওয়ার আশায়, দেখে সে অনেকক্ষণই জলের নীচে রয়েছে, প্রতক্ষ্য কল্পনায় সে ভাটির টানে বেশ দূরে গিয়ে সুরক্ষিত আছে। সৈনিকেরা বন্দুকে গুলিভরা প্রায় শেষ করে এনেছে, সবকটা ধাতব নল পরিষ্কার করার ডাণ্ডাগুলি সূর্যালোকে ঝলসে ওঠে যেহেতু তারা বন্দুকের নল থেকে বের করে আকাশের দিকে ঘুরায় এবং আবার তার নির্দিষ্ট স্থানে ঢুকিয়ে রাখে। দুজন প্রহরী আবার গুলি ছোড়ে স্বাধীনভাবে এবং অকার্যকর ভাবে।

অপহৃত মানুষটি সব দেখে তার কাঁধের ওপর থেকে। সে এখন স্রোতের পক্ষে প্রাণপণ সাঁতরে চলেছে। তার মস্তিষ্কও তার হাত এবং পায়ের মতো তেজীয়ান। সে এখনও ভাবতেও পারছে বিদ্যুৎগতিতে।

'অফিসারটি' সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে 'এত তৎপর গোলান্দাজ দ্বিতীয় বার আর এই ভুল করবে না। একটি গুলিকে একবার এড়িয়ে যাওয়া সহজ। সে নিশ্চয় ইতিমধ্যে যে যেমন পারে গুলি করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। ভগবান সহায় হও, আমি সবগুলি এড়িয়ে যেতে পারব না।"

তার দু'গজের ব্যবধানে একটি ভীতিপ্রদ জলের ছিটের সঙ্গে উচ্চকিত তেড়ে আসা শব্দ ক্রমশ হ্রাস পায়, যা তার মনে হয় দুর্গ থেকে বেরিয়ে বাতাসে ভ্রমণ করে নদীর জলের গভীরে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। একটি জলের তরঙ্গ চাদরের মতো উড়ে এসে তাকে

আচ্ছাদিত করে দেয়। অন্ধকরে দেয়, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। তার মানে এই খেলায় কামানও ব্যবহৃত হচ্চে। সে যখন তার মাথা এই তুমুল আলোড়ন থেকে মুক্ত করে, সে শুনতে পায় গতিভ্রষ্ট গুলি চলে গেছে বাতাস ভেদ করে অনেক দূরে এবং তা ঐ দূরের জঙ্গলের গাছপালা ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়েছে।

"তারা একাজ আবার করবে না।" সে ভাবে "পরের বার তারা ছররা দিয়ে গুলি করবে। আমাকে তাদের বন্দুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ধোঁয়াই আমাকে জানান দেবে। গুলি আসবে অনেক দেরি করে, এ গোলাগুলির পিছন পিছন ছোটে। এটি একটি ভাল বন্দুক বটে।"

হঠাৎ তার মনে হয় সে ঘুরছে আর ঘুরছে,লাট্টুর মতো পাক খাচ্চে। এই জল, নদীরপার, জঙ্গল এখন অনেক দূরের। সেতু দুর্গ এবং মানুষগুলিও সব অস্পষ্ট এবং একাকার। বস্তুগুলিকে শুধুতার রং দিয়ে চেনা যাচ্ছে। বৃত্তাকার কিংবা লম্বাকৃতি কিছু ইতস্তত রং এসবই সে দেখছে। সে একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আছে এবং ঘুরছে একই তীব্রতায় একই জায়গায়। এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় থেকে সে অসুস্থ বোধ করছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে উড়ে গিয়ে পড়ে পাথরের উপর, নদীর বাঁদিকে। দক্ষিণপারের একটা শুকনো জায়গা যেখান থেকে তার শত্রুরা তাকে দেখতে পাবে না। হঠাৎ এই গতি, তার এক হাত পাথরে ঘষে যাওয়ায় সে থামে, আনন্দে কেঁদেই ফেলে। সে তার আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ে এবং মুঠো করে তারই উপর ছুঁড়ে দেয় যাতে একটা অন্তত শব্দ বর্ষিত হয়। এ গুলোকে দেখতে হিরে চুনি পান্নার মতো লাগছে। সে ভাবে আর কী কী আছে সুন্দর যার মতো লাগছে এগুলি। পারের গাছগুলিও তার বাগানের মতো বিশাল, সে ওগুলোর সারিবদ্ধ ভাবে সেজে থাকার একটা বিশেষত্বও লক্ষ করে। ওদের ফুলের গন্ধও শোঁকে। একটা আশ্চর্য গোলাপী আভা তাদের ডালপালার ভিতর দিয়ে ইওলিয়ার বীণা থেকে নির্গত সঙ্গীতের মতো বাতাসের দোলায় তাদের ডালপালা থেকে নির্গত হচ্চে। তার পলায়নকে নিখুত করার কোন সদিচ্ছাই এখন তার নেই। সে নিশ্চিন্তে এখানে এই অপার্থিব পরিবেশে শুয়ে থাকতে চায় যতক্ষণ না তাকে কেউ সরিয়ে নিচ্ছে।

একটা শাঁশা এবং ঝনঝনানো ছররার শব্দ তার মাথা থেকে অনেক উপর গাছের ডালের উপর দিয়ে চলে যাওয়ায় তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। বিভ্রান্ত কামানদার তার দিকে ক্রমাগত গোলা ছুড়ে যেন তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ায়। দৌড়ে যায় ঢালু পারে এবং ঝাঁপ দেয় জঙ্গলের ভিতর।

সারাটা দিন সে ঘুরে বেড়ায়। মাথার উপর সূর্য গোল হয়, তবু সে দৌড়য়। জঙ্গলের কোনো শেষ নেই। কোথাও সে থামার পথ পায় না, একটা কাঠুরের বুনো পথ পর্যন্ত নেই। সে জানতই না যে এরকম একটা বনাঞ্চলে সে বাস করত। একটা অস্বাভাবিক অবাস্তব কিছু সে অনুভব করে।

রাতের দিকে সে ক্লান্ত, ক্ষতপদ এবং ক্ষুধায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। স্ত্রীও ছেলেমেয়ের কথা ভাবে। শেষ পর্যন্ত সে একটা পথ খুঁজে পায় যা তাকে সঠিক দিশা বাৎলে দেয়। এটা শহুরে পথের মতো বড় এবং সোজা। তাও মনে হয় এখানে কেউ হাঁটে না, কোনোদিন হাঁটেনি। খুব বেশি না হলেও কুকুরের ডাকে বুঝা যাচ্ছে মনুষ্যবসতি আছে কাছাকাছি। গাছের কালো গুঁড়িগুলি রাস্তার পাশে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে দুদিকে, যেন দিগন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে এক বিন্দুতে। যেন চিত্রানুপাতিক দৃশ্যের অঙ্কন শেখানো হচ্চে। যখন সে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাথার উপর আকাশ দেখে, তারাগুলিকে বড় অপরিচিত লাগে, এবং এক আশ্চর্য তারকাপুঞ্জেও বিভক্ত মনে হয়। সে নিশ্চিত ওদের ওরকম জড়ো হওয়ার কোন গোপন এবং অশুভ অভিসন্ধি আছে। জঙ্গলের দুদিকে সে শুনতে পায় একই কোলাহল, যার মধ্যে একবার দুবার এবং বারবার সে স্পষ্টভাবে শুনতে পায় এক অপরিচিত কণ্ঠের ফিসফিসানি।

তার কাঁধে ভীষণ ব্যাথা। সে হাত উঠিয়ে অনুভব করতে গিয়ে টের পায় মারাত্মক ভাবে ফুলে গেছে। সে জানে ওখানে একটা গোল কালো দাগ আছে যেখানে দড়িটা বাঁধা ছিল। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আছে। কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। জিহবা তেষ্টায় ফুলে গেছে। উত্তেজনা কমাতে সে দাঁতের পাটির মাঝখান দিয়ে বের করে ঠাণ্ডা বাতাসে কিছুক্ষণ মেলে দেয় জিভ। কী মোলায়েম ভাবে ঘাসগুলি গালিচার মতো কুমারী পথের উপর বিছানো রয়েছে। সে আর পথের কোন অনুভব পাচ্ছে না পায়ের নীচে।

নিশ্চিতভাবে তার এত কষ্টের মধ্যেও সে ঘুমিয়ে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে, কারণ সে এখন অন্য দৃশ্যে চলে গেছে। বোধহয় সে এক বিকারের ঘোর থেকে সদ্য উঠে এসেছে। সে তার বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যেমন ছেড়ে গেছিল তেমনই তো আছে, সবই সুন্দর এবং উজ্জ্বল হয়ে আছে প্রভাতী সূর্যালোকে। সে তো সারারাত পথ হেঁটেছে। সে যখন ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে প্রশস্ত সাদা রাস্তা দিয়ে ঢুকছে, সে দেখে নারীর কাপড় বাতাসে উড়ছে, তার স্ত্রীকে দেখতে বেশ শান্ত ও মিষ্টি লাগছে। বারান্দা থেকে হাসিমুখে নেমে আসছে তাকে

দেখতে। সিঁড়ির নীচে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। কি অপরূপ তার সৌন্দর্য আর গাম্ভীর্য। আহ! সে কী সুন্দর! সে উৎসাহে আনন্দে এগিয়ে যায়, হাতবাড়িয়ে দেয়। সে যখনই তাকে অনুভব করতে যায় এক বিরাট ধাক্কা তার ঘাড়ের পিছনে। অন্ধকরা এক সাদা আলো জ্বলে ওঠে, যার শব্দ কামানের গোলার মতো। তারপর সব অন্ধকার ও নিস্তব্ধ।

পেটন ফারকুহার মৃত। তার দেহ, ভাঙা কাঁধ নিয়ে মৃদু দুলেছে এদিক থেকে ওদিকে আউল ক্রীক সেতুর নীচে কাঠের গুঁড়ির তলায় ।

একদিকে আব্রাহাম লিংকন এর ইউনিয়ন আর অন্যদিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি নিয়ে জেফারসন ডেভিসের কনফেডারেসি বা সাউথ। ১৮৬১ থেকে ১৮৮৫ র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে ইউনিয়ন জয়ী হয়। সিভিল ওয়ার শেষে দাসপ্রথা সমাপ্ত হয় এবং অন্য অনেক গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যায় আমেরিকার উত্তরাংশ। ইউনাইটেড স্টেটস এক শক্তপোক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জয়ীপক্ষ ফেডারেল আর্মির সেকেন্ড লেফটেনেন্ট এমব্রোস বিয়ার্সের এই বিখ্যাত ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। একাত্তর বছর বয়সে তিনি উধাও হয়ে যান। কেউ কেউ বলে ঘাতক হাতে মৃত্যু হয়।

****